দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ • ৮ ম সংখ্যা • ১৫ জুলাই ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে ঃ সংসদে রাহুল গান্ধী ২
- মণিপুরের প্রতি কেন্দ্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন চাই। ৪
- তৃতীয়বার মণিপুরে এলেন রাহুল গান্ধী ৬
- ব্রিটেনের নির্বাচনে শতাব্দীর শোচনীয়তম পরাজয়ের মুখে পড়ল কনজারভেটিভ পার্টি (টোরি পার্টি) ৬
- নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে নয়া পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচি ৮
- ফ্রান্সে অতি দক্ষিণপন্থার বিপর্যয় ১১
- বিপদ শিয়রে, বাতিল করো নতুন দন্ডসংহিতা ১১
- জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ ১৪
- এক ড্রাইভার কী মওত (রেল দুর্ঘটনার ময়নাতদন্ত) ১৭
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ মানবিকতার আলোকে হুমায়ুন কবীর ১৯
- নদী তুমি কার ২২
- অগ্নিপথ যোজনা কি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে আত্মঘাতী ? ২৫

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

ফ্রান্সের নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়

গত দুই দশক ধরে বিভিন্ন দেশে নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান হচ্ছিল। এই আশঙ্কার মধ্যে গোটা বিশ্বের নজর ছিল ফ্রান্সের দিকে।আশা ছিল, পৃথিবীর বুকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র পতাকা ওড়ানো প্রথম দেশটি এতো সহজে ফ্যাসিস্টদের জায়গা ছেড়ে দেবে না, প্যারি কমিউনের মাটি এতো সহজ ঠাঁই নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইভেন্ট ছিল ফ্রান্সের এই নির্বাচন।অতি দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট নেতা লি পেনের উত্থান ফ্রান্স ফুটবল দলের তারকা খেলোয়ারদেরও আশঙ্কিত করে তুলেছিল।তাই ফরাসী ফুটবল ফেডারেশনের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করে লি পেনকে হারানোর ডাক দিয়েছিলেন এমবাপ্পে।

ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানকে আটকাতে বামপন্থী চারটি দল, কমিউনিস্টরা, সোশ্যালিস্টরা, গ্রিন পার্টি, আর জ্যাঁ লুক মেলেশোঁর দল আনবোড ফ্রান্স; সকলে মিলে নয়া পপুলার ফ্রন্ট বানিয়ে মেরিন লে পেনের ছুঁড়ে দেওয়া ফ্যাসিবাদী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।এবারের নির্বাচনে সবথেকে বেশি আসনে জয়ী হয়েছে এই জোট (১৮২টি আসন)।দ্বিতীয় স্থানে ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর অ্যালায়েন্স অ্যাসেম্বল(১৬৮টি আসন)। ফ্যাসিস্ট লি পেন'র ন্যাশনাল র‍্যালি অনেকটাই পিছনে তৃতীয় হয়েছে(১৪৩টি আসন)।

পার্লামেন্ট ত্রিশঙ্কু হলেও লি পেন অনেকটাই পিছনে তৃতীয় অবস্থানে আছে; এটাই স্বস্তির। এবারে ইউরোপের দেশগুলির নির্বাচনে আরেকটা বড়ো ইস্যু অবশ্যই প্যালেস্তাইন সংহতির প্রশ্নটি। ইংল্যান্ডের নির্বাচনে, বহু প্যালেস্তাইনপন্থী প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

এবার ফ্রান্সেও সেই একই দৃশ্য, প্যালেস্তাইনের পক্ষে রায় দিয়েছেন মানুষ, লাল পতাকার সঙ্গে উড়ছে প্যালেস্তাইনের পতাকাও।ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই ফ্যাসিস্ট শক্তি রাস্তায় নেমে পড়েছে, দাঙ্গা করছে, হাঙ্গামা করছে।শ্রমিক শ্রেণি প্রতিরোধের রাস্তায়।

প্যারি কমিউন দুনিয়াকে দিয়েছিল সর্বহারার আন্তর্জাতিক সংগীত - লা ইন্টারন্যাশনাল। উচ্ছ্বসিত ফরাসী জনতার সোচ্চার সমবেত কণ্ঠে আজ আবার লা ইন্টারন্যাশনাল। নয়া পপুলার ফ্রন্ট মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৩০ সালে ইউরোপ জুড়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে শক্তিশালী হতে থাকা, বিশেষ করে জার্মানি দখল করে ফেলা ফ্যাসিবাদের প্রেক্ষাপটে, ফ্রান্সে তৈরি হওয়া পপুলার ফ্রন্টকে।

কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে ঃ সংসদে রাহুল গান্ধী

সৌর বসু

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়াকে, বিজেপির ব্যর্থতা বলে মনে করেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। সম্প্রতি করন থাপারের সঙ্গে কথোপকথনের সময় অধ্যাপক সেন বলেছেন, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে ভারতের জনসাধারণ। ভারত একটি বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ভারতের মহান ঐতিহ্য। বিজেপির দশ বছরের শাসনে, সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার হয়েছে ।সংখ্যালঘু মুসলিম, খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। গরুকে বাঁচানোর অজুহাতে মুসলিমদের হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

ভারতে কুড়ি কোটি মুসলিম বসবাস করে ,অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি দলে তাদের কোন এম.পি সংসদে নেই। মন্ত্রীসভায় একজনও মুসলিম নেই ।এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক বলে অমর্ত্য সেন মনে করেন।

লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর জন্য বিজেপির ঔদ্ধত্য কমবে বলে মনে করা হয়েছিল।

বর্তমান লোকসভায় বিরোধীপক্ষের নেতা হিসেবে দ্বর্থহীন ভাষায় রাহুল গান্ধী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির ভীতি প্রদর্শনের নীতি আর বরদাস্ত করা হবে না। বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন যারা নিজেদের হিন্দু বলেন তারা হিংসাকে প্রশ্রয় দেন, মিথ্যাকে আশ্রয় করে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ান ।শিবের ছবি প্রদর্শন করে তিনি বলেন ডরো মাত, ডরাও মাত। খ্রিষ্টান, জৈন, ইসলাম, বৌদ্ধ ,শিখ সকল ধর্মের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন সকল ধর্মেই নির্ভীকতার কথা বলা আছে।

রাহুল গান্ধী সেদিনের ভাষণ, রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন–

‘‘আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ।।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে –
তাই ব’লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ।।’’

রাহুল গান্ধীর বক্তৃতা দেওয়ার সময় সরকার পক্ষ থেকে বারবার বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ , রাজনাথ সিং , ভূপেন্দ্র যাদব , শিবরাজ সিং চৌহান ,কিরণ রিজিযু প্রমুখ অন্য মন্ত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে বারবার রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব।

তিনি শিবজির ছবি দেখিয়ে বলেন , এই ভগবান বরাভয় দেখিয়ে সকলকে বলছেন ‘ডরো মাত, ডরাইয়ে মাত।’ সব ধর্মগুরুদের বাণী এক।’ ভয় পেওনা, ভয় দেখিওনা।’ অথচ বিজেপি হিন্দু ধর্মের নামে সবসময় ‘ নফরত ‘ অর্থাৎ ঘৃণা ও হিংসা ছড়ায়।

ট্রেজারি বেঞ্চের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী বলেন আপনারা হিন্দু নন। প্রকৃত হিন্দু সত্যকে মেনে চলে। সত্যের থেকে বিচ্যুত হলে তাকে হিন্দু বলা যায় না। নরেন্দ্র মোদী রাহুলের উদ্দেশ্যে বলেন হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী তড়িৎ উত্তর দেন বিজেপি এবং আরএসএস সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নয়। নির্বাচনী প্রচারের সময় মোদীজি বলেছিলেন,

গান্ধীর উপর নির্মিত চলচ্চিত্র দেখে নাকি মানুষ গান্ধীজি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এর উত্তরে রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদির জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। নরেন্দ্র মোদির নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত দূত সম্পর্কিত মন্তব্যেরও তিনি তির্যক সমালোচনা করেন। অগ্নিবীর প্রকল্প এবং মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার দুর্নীতির বিষয়েও বিজেপিকে রাহুল গান্ধীর করা সমালোচনা মুখে পড়তে হয়।

লোক সভার স্পিকার ওম বিড়লা কে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন লোকসভাতে স্পিকার হচ্ছেন প্রধান পুরোহিত। তিনি লোকসভা পরিচালনা করেন। গণতন্ত্র স্পিকারকে সংসদে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেছে। স্পিকার যখন প্রধানমন্ত্রীর সামনে মাথা নত করেন তখন কিন্তু গণতন্ত্রকে অবমাননা করা হয়। রাহুল গান্ধী যখন বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে লোকসভার অধিবেশনের প্রারম্ভে স্পিকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে যান, তখন প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাকে মাথা নত করতে দেখা যায়। যদিও রাহুল গান্ধীর প্রতি তাঁর আচরণ ছিল স্বাভাবিক।

অযোধ্যাতে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে সারা ভারত জুড়ে বিজেপির প্রচার ছিলো তুঙ্গে। সমস্ত দূরদর্শন চ্যানেলে সেই ছবি দেখানো হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর দেখা গেল অযোধ্যার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাহুল গান্ধীর পাশে উপবিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অবধেস প্রসাদকে দেখিয়ে তিনি বলেন, মাননীয় সাংসদ সেই বার্তা বহন করছেন। কেন অযোধ্যার মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রত্যাখ্যান করল তার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন। অযোধ্যার উন্নয়ন করতে গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি স্থানীয় গরিব মানুষদের দোকান পাটের উপর বুলডোজার চালিয়েছে। এয়ারপোর্ট তৈরি করার জন্য সাধারণ মানুষের জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় অযোধ্যার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি, আম্বানি। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে ব্যালট বাক্সে।

তিন কৃষি আইন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন এই বিতর্কিত আইন কৃষকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছে। কৃষি আইন তৈরি হয়েছে

শিল্পপতিদের সুবিধার্থে। এই আইনের বিপক্ষে যারা লড়াই করছে সেই কৃষকদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতির জন্য আজ দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিল্পে বিনিয়োগের খরা। জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী।

মনিপুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন বিগত এক বছর ধরে মনিপুরে গৃহযুদ্ধ চলছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সে ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথা নেই। তারা মনে করেন না যে মনিপুর ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদব তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র অত্যন্ত জোড়ালো ভাষণ দেন।

রাজ্যসভাতেও বিরোধী জোটের সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে বিজেপি সরকারকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন মিথ্যা তথ্য প্রচার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে বিভাজিত করতে চাইছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণেও ভারতবর্ষের মূল সমস্যার কথা উত্থাপিত হয়নি। ভাষণটি ছিল বিজেপি সরকারের প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

রাজ্য সভাতে তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা সাগরিকা ঘোষ মনিপুর প্রসঙ্গে বলেন, বিগত এক বছর ধরে মণিপুরে গৃহযুদ্ধে ২০০ জন নিহত হয়েছেন এবং ৬০০০০ জন গৃহহীন হয়েছেন, তৎসত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টি কোন হেলদোল নেই। তিনিও রাজ্য সভাতে সরকার বিপক্ষে তীব্র সমালোচনা করেন।

বস্তুত পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি ভাবতে পারেনি, বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধী জোটের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে তাদের উপর এরকম আক্রমণ নেমে আসবে। বিগত ১০ বছর বিজেপি কোনও প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়নি। সমস্ত দেশ জুড়ে তারা অত্যাচার অনাচার এবং ভীতি প্রদর্শন করে গেছে। নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে এই প্রথম একতরফা দাপটের বদলে সমানে সমানে লড়াইয়ের ছবি ফুটে উঠল। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর যুক্তিভিত্তিক নির্ভীক বাক্যবাণের সামনে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যদের বিভ্রান্ত এবং হতচকিত ঠেকেছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছিল অন্তঃসারশূন্য। রাহুল গান্ধী বিরোধী পক্ষের সমালোচনার সুর উচ্চ গ্রামে বেঁধে দিয়েছেন। এখন প্রয়োজন বিরোধী জোটকে একসূত্রে বেঁধে সহিষ্ণু, উদার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকল্প রচনা করা।

মণিপুরের প্রতি কেন্দ্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

মনিরুল হক

এ তো বক্তৃতা নয়, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমানের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভের এক তীব্র বহিপ্রকাশ। মধ্যরাতে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ধেয়ে আসা মাত্র ১০ মিনিটের ঝড় লন্ডভন্ড করে দিল দিল্লীর ভন্ড রাজার সাজানো রাজকক্ষ। ঝড় আসবে জানাই ছিল তাই তার মোকাবিলার জন্য এক হীন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন রাজা ও পারিষদগণ।

কথা ছিল সংসদে আজকেই (১জুলাই, ২০২৪) মণিপুর নিয়ে বলবেন মণিপুরের নতুন জনপ্রতিনিধি কংগ্রেস দলের আঙ্গোমচা বিমল আকোইজাম। পরিকল্পিত গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত মণিপুরের আপামর জনগণও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সদ্য নির্বাচিত নিজেদের সেই সাংসদের বক্তৃতা শোনার জন্য। কিন্তু নানান ছল-চাতুরিতে সেই বক্তৃতার সময় পিছোতে লাগল। সন্ধ্যে ৫ টা থেকে অপেক্ষা করতে করতে অধ্যাপক আকোইজামকে সময় দেওয়া হল মধ্যরাতে। তিনিই সেদিনের শেষ বক্তা। শাসক বিজেপি এবং তাদের বশংবদ স্পীকার সাহেব ভেবেছিলেন; ফ্লোর খালি, কে-ই বা শুনবে মনিপুরের কথা! কিন্তু অধ্যাপক আকোইজামের সেই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কাঁপিয়ে দিয়েছে ভন্ড রাজাকে, মাঝরাতেই জাগিয়ে দিয়েছে মণিপুর, উত্তর-পূর্ব ভারত সহ আপামর দেশবাসীকে।

অধ্যাপক আকোইজাম বলেছেন, মণিপুর আজ রাষ্ট্রহীন। এক বছরের বেশি সময় ধরে মণিপুর জ্বলছে, চলছে ভ্রাতৃঘাতী হিংসা। সেখানে না আছে কোনও প্রশাসন, না আছে কোনও সরকারী বিধি-ব্যবস্থা। সেখানকার মাটির প্রত্যেক বর্গ সেন্টিমিটারই দখল করে আছে সেনাবাহিনী। মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়, অবহেলিত। অথচ মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণে মণিপুরের কোন উল্লেখই নেই!

মণিপুরের প্রতি এই অবহেলা অধ্যাপক আকোইজামকে ব্যথিত করেছে। তাই তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন- 'IS THIS SILENCE COMMUNICATING TO THE PEOPLE OF THE NORTH-EAST AND PARTICULARLY MANIPUR THAT YOU DO NOT MATTER IN THE INDIAN STATE'S SCHEME OF THINGS ?'

আর উত্তর? সে তিনি নিজেই দিয়েছেন দৃঢ় কণ্ঠে- 'THIS IS NOT A SIMPLE ABSENCE. IT IS A REMINDER OF RASHTRA CHETANA WHICH EXCLUDES PEOPLE !' রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমাদের দেশের কথা বলা হচ্ছে অথচ তার একটা অংশে মণিপুরের মানুষকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট করেছেন। একটা রাষ্ট্র আছে কিন্তু সেখানকার সব মানুষের সুখ-দুখের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের কাছে মানুষ কি অপ্রয়োজনীয়? গুরুত্বহীন? রাষ্ট্র মানে কি শুধু ভূখন্ড আর তার সম্পদ? ধিক্কার জানাই এই রাষ্ট্র চেতনাকে। এখনও কি ভারতে সেই যুগ চলছে যে যুগে ঔপনিবেশিকরা বুঝত শুধু শোষন আর শোষনের উদ্দেশ্যে শাসন? কর্তৃত্ব ফলিয়ে অন্য দেশের সম্পদ আর মানুষকে শোষন করে নিজেরা সম্পদশালী হওয়ার দিন কি এখনও ফুরোয় নি? আমরা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও এক নতুন উপনিবেশবাদের জন্ম দিয়েছি?

উপনিবেশবাদ বলতে আমরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যকেই বুঝি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞা বলেছেন, উপনিবেশবাদ আসলে হল এক মানসিক বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসাবে তিনি এইদিনই লাগু হওয়া নতুন দন্ড সংহিতা আইনের উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক সময়ের আইনকে বাতিল করে এই আইনকে নতুন এক আইন বলে লাগু করা হলেও ঔপনিবেশিক আইনের সব বৈশিষ্ট্যই এই নতুন আইনের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখা, বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কাল আটকে রাখা প্রভৃতি বৈশিষ্ট নিয়ে এই আইন বরং আরও বেশি বেশি জনবিরোধী। একই রকম ভাবে দিল্লীতে বসে মণিপুর শাসন করতে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন এক ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিচ্ছেন বলে অধ্যাপক আকোইজাম মনে করেন। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন- 'THERE IS A CONTINUITY BETWEEN COLONIAL AND POST COLONIAL PERIOD ..... THIS CONTINUITY OF COLONIALISM IS SHOWN BY NEGLECTING THE TRAGEDY OF A STATE'

১৪ মাস ধরে জিইয়ে রাখা জাতি দাঙ্গায় ২০০র ও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার গ্রামকে জ্বালিয়ে শ্মশানে পরিণত করা হয়েছে, ৬০০০০ এরও বেশি মানুষ শরণার্থী শিবিরে বাস করছেন আর সরকার নীরব দর্শক হয়ে মানুষের এই ট্রাজেডি উপভোগ করে যাচ্ছেন। একটা দেশের একটা রাজ্যের মধ্যেই BUFFER ZONE– LINE OF CONTROL প্রভৃতি বিরাজ করছে আবার সেই সঙ্গে বহাল তবিতয়ে আছে একটা রাজ্য সরকার; আছে উদ্ধত, কর্তৃত্ববাদী কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর বক্তৃতার মাঝে বিজেপি সদস্যরা বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে অধ্যাপক আকোইজাম বিজেপির তথাকথিত জাতীয়তাবাদকেও আক্রমণ করেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন–'KEEP YOUR HANDS ON YOUR HEART AND THINK ABOUT THE HOMELESS– THE MOTHERS AND THE WIDOWS. THINK OF THEM AND THEN TALK ABOUT NATIONALISM'

এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে যখন বিজেপির সদস্যরা তাঁকে থামানোর চেষ্টা করে চলেছেন তখন অসংখ্য মানুষের কান্না আর ক্ষোভকে ক্রোধে পরিণত করে অধ্যাপক আকোইজামও বলেছেন– 'I WILL KEEP QUIET THE MOMENT THE PRIME MINISTER OPENS HIS MOUTH...' ঔদ্ধত্বের মুখে এমন চুনকালি ক'জনই বা মাখাতে পারেন!

ভারতীয় সংসদে অধ্যাপক আকোইজামের মধ্যরাতের এই বক্তৃতা মনে করিয়ে দিল আরও এক ঐতিহাসিক বক্তৃতাকে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট এইরকম মধ্যরাতেই পন্ডিত নেহরু তাঁর 'TRYST WITH DESTINY' বক্তৃতায় বলেছিলেন– 'AT THE STROKE OF THE MIDNIGHT HOUR– WHEN THE WORLD SLEEPS– INDIA WILL AWAKE TO LIFE AND FREEDOM'. তুলনা না করেও বলা যায়, অধ্যাপক আকোইজামের মধ্যরাতের এই বক্তৃতা শাসনের নামে বিজেপির ঔপনিবেশিক আচরণের প্রতি এক তীব্র সতর্কীকরণ। তাঁর বক্তৃতা মণিপুরের প্রতিটি মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে, দ্বিখণ্ডিত এক সভ্য সমাজ নতুন সকালের প্রত্যাশায় জেগে উঠছে। আপামর ভারতবাসীও দেখছেন ভন্ড রাজার বিরুদ্ধে দেশের দিকে দিকে জনমত জোরালো হয়ে উঠছে।

দেশের মানুষ যে জেগে উঠছেন তার প্রমাণ আমরা দেখছি সংসদে। এদিনই দিনের বেলায় রাহুল গান্ধী পেশ করেছেন তাঁর সেই যুগান্তকারী বক্তৃতা। সমস্ত দেশবাসীকে তিনি শুনিয়েছেন তাঁর অভয় বাণী– 'ডরো মৎ, ডরাও মৎ'। কথাটি বলার সময় তিনি বিজেপি সাংসদদের দিকেও তাকাচ্ছিলেন কারণ তাঁরাও তো 'ডরপোক' হয়ে আছেন ভন্ড রাজার ভয়ে! এদিকে আবার রাহুলের ভয়ে ডরপোক হয়ে পড়েছেন ভন্ড রাজা ও তাঁর পারিষদরা। রাহুল গান্ধীর বক্তৃতার সময় তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছে সর্বমোট ৫০ বারেরও বেশি। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ২ বার, অমিত শাহ ৪ বার, রাজনাথ সিং ৩ বার, কিরন রিজিজু ৬ বার, শিবরাজ চৌহান ৩ বার, অশ্বিনী বৈষ্ণব ৪ বার, অনুরাগ ঠাকুর ৬ বার, নিশিকান্ত দুবে ১০ বার বাধার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রাহুলকে দমানো তো যায়ই নি উল্টে তিনি দন্ডী কাটা আর এস এস–এর স্পীকারকেও রীতিমতো কড়কে দিয়েছেন।

স্পীকারের কাছে দাবি ছিল পরদিন মণিপুরের আর একজন সাংসদ আলফ্রেড কে এস আর্থারকে অন্তত দু'মিনিট সময় দিতে হবে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য। কিন্তু স্পীকার সে দাবি মানেন নি। অধ্যাপক আকোইজাম সহ উত্তর–পূর্ব ভারতের একদল সাংসদ এর প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে স্পীকার প্রধানমন্ত্রীকে জবাবী ভাষন দেওয়ার অনুমতি দিলে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করেই তাঁর ভাষনের পুরোটা সময় ধরে তাঁদের প্রতিবাদ চালিয়ে যান। এই প্রতিবাদে যোগ দেন সমগ্র বিরোধী পক্ষ। মণিপুরের মানুষের জন্য ন্যায্য সম্মান চেয়ে সমস্বরে একনাগাড়ে তাঁরা দাবি করতে থাকেন– JUSTICE FOR MANIPUR. গত দশ বছরে এরকম দৃশ্য এই প্রথম দেখা গেল। ১৮তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই দল হিসাবে বিজেপি ও তাঁদের ভন্ড রাজার ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল। তবে শুধু সংসদের অভ্যন্তরে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেই হবে না, বিজেপির ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে পরাজিত করতে হলে সংসদের বাইরেও সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। আশার কথা, সারা ভারত জুড়ে সেই ঐক্য গঠনের এক আন্তরিক প্রয়াস আমারা লক্ষ করছি।

তৃতীয়বার মণিপুরে এলেন রাহুল গান্ধী

অমিতাভ সিংহ

একবছরেরও বেশী সময় ধরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে জীর্ণ বিদীর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মনিপুর। কুকি ও মেইতে এই দুই গোষ্ঠী একে অপরের এলাকায় প্রবেশ করলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নয়। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং ও কেন্দ্রীয় সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তপ্ত এই রাজ্যে গত ১৪ মাসে একবারের জন্যও যান নি।অথচ মণিপুরে সংসদের বিরোধী দলের নেতা তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী গত সোমবার ৮ জুলাই তৃতীয় বার পৌঁছে গিয়ে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি একাধিক ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। দুই গোষ্ঠীই তাঁর হাতে তুলে দেয় স্মারকলিপি। বিরোধীনেতা রাজধানী ইম্ফলে বসে রাজ্যের মানুষকে ভরসা দিলেন ও একইসঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একবারের জন্য মণিপুরে এসে এই সংঘর্ষ অবসানের সমাধানসূত্র তৈরী করার জন্য অনুরোধ জানান।

এই সফরে প্রথমে তিনি জিরিবামে এক শরণার্থী শিবিরে আবাসিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ শোনেন। তাঁর পরের গন্তব্য ছিল কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর। সেখানের শিবির পরিদর্শনের পর কুকিদের সংগঠন আইটিএলএফ তাঁর হাতে আট দফা দাবীর স্মারকলিপি তুলে দিয়ে জানান যে সেই রাজ্যে কার্যত কোনও সরকার নেই। কুকিদের বিরুদ্ধে পুরো প্রশাসন, পুলিশ,অসামরিক সশস্ত্র বাহিনী কাজ করছে। কুকিদের নিরাপত্তা দিতে তারা ব্যর্থ। এরপর রাহুল গেলেন মৈরাং এর ফুলবালা শরণার্থী শিবিরে।

ইম্ফলে মেইতেই দের সংগঠন কোকমির প্রতিনিধিরাও রাহুলের হাতে তুলে দেওয়া স্মারকলিপিতে দাবী করেন কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ। মাদক সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলে দাবী করে মোদী সত্যকে লুকোচ্ছেন।এরপর রাহুল গান্ধী রাজ্যের বিভিন্ন প্রসাশনিক কর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন রাজ্য কার্যত দু টুকরো হয়ে গিয়েছে , হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, কয়েকশ মানুষ নিহত, তাও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্তত একবার এখানে এসে মানুষের কথা শুনে তাঁদের আস্বস্ত করুন। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর তিনি যে তৃতীয়বার এই রাজ্যে এলেন তা উল্লেখ করে বলেন পরিস্থিতি একইরকম রয়েছে।মানুষ শোচনীয় অবস্থায় আছেন। হিংসা কখনও কোন সমাধানসূত্র আনতে পারে না।

উল্লেখ্য যে রাহুল গান্ধী যখন প্রথম বার এই রাজ্যে আসেন তখন কুকি এলাকা সফরের সময় মেইতে গাড়ী চালক বা মেইতে এলাকায় সফরের সময় কুকি গাড়ী চালক গাড়ী চালাতে রাজী হন নি।এখনও একই অবস্থা। তারপর তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময় এই মনিপুর থেকেই যাত্রা শুরু করেন ও মনিপুরবাসীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থা অর্জন করেন। তারই ফলশ্রুতি এই রাজ্যের দুটি লোকসভার আসনে জনগণ কংগ্রেসকে জয়ী করেছেন। শুধু তাই নয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র অসম , ত্রিপুরা ও অরুনাচল বাদে বাকি সবকটি রাজ্যে বিজেপি শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে।মোদী – শাহ – হিমন্তের সাধের ' নেডার ' অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ব্রিটেনের নির্বাচনে শতাব্দীর শোচনীয়তম পরাজয়ের মুখে পড়ল কনজারভেটিভ পার্টি (টোরি পার্টি)

চোদ্দ-বছরের ভয়াবহ টোরি জমানার অবসান। ১৮৩৪ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রিটেনের সংসদে দলের এত কম প্রতিনিধিত্ব অতীতে কখনও দেখা যায়নি।রাতারাতি সাফ হয়ে গিয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ। ২৪৪ জনকে হারিয়ে সদস্য সংখ্যা নেমে এসেছে একেবারে ১২১-এ।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ সংসদের নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমন্সে কিয়ের স্টার্মারের লেবার পার্টির সাংসদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে হয়েছে ৪১২। ৬৫০-সদস্যের সংসদে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার চেয়েও ৮৬টি আসন বেশি। অনেকেই তুলনা টানছেন ১৯৯৭ সালের সঙ্গে। সেবার নির্বাচনে টোরি প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে ক্ষমতাচ্যুত করে যেভাবে ডাউনিং

স্ট্রিটে প্রবেশ করেছিলেন লেবার পার্টির নেতা টনি ব্লেয়ার, এবারেও যেন ঠিক তেমনই, টোরি নেতা ঋষি সুনককে ধরাশায়ী করে প্রধানমন্ত্রী লেবার প্রধান স্টার্মার।

লেবার জিতেছে ঠিকই, কিন্তু কতটা জনপ্রিয়? মাত্র ৩৩.৮ শতাংশের সমর্থনে দল পেয়েছে সংসদের প্রায় ৬৫ শতাংশ আসন। যেখানে ২০১৭-তে জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে লেবার পেয়েছিল ৪০ শতাংশ ভোট। পরে ২০১৯-এ করবিনের নেতৃত্বে লেবারের হারের জন্য যখন জনপ্রিয়তা হ্রাসকে দায়ী করা হয়, তখন সমর্থনের হার ছিল এবারের চেয়ে দু' শতাংশেরও কম, ৩২.২ শতাংশ। সেবারে ভোটদানের হার ছিল ৬৭ শতাংশ।এবারে রেকর্ড কম, ৬০ শতাংশ।

তারপরেও, এবারে মাত্র ১.৬ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে লেবার পেয়েছে অতিরিক্ত ২১১টি আসন!

স্টার্মারের লেবার করবিনকে বহিষ্কার করলেও, নির্দল হিসেবে নর্থ ইসলিংটন থেকে দাঁড়িয়ে ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছেন তিনি। হারিয়েছেন লেবারের চাপিয়ে দেওয়া প্রার্থীকে। ১৯৮৩-তে এই কেন্দ্র থেকে প্রথম জিতেছিলেন করবিন। তারপর থেকে টানা জিতে চলেছেন। একবারের জন্যও পরাজিত হননি। এবারে ৭,২৪৭ ভোটে হারিয়েছেন লেবারের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী প্রফুল নারগুণ্ডকে।করবিন পেয়েছেন ২৪,১২০ ভোট, বিপরীতে লেবারের প্রার্থী পেয়েছেন ১৬,৮৭৩ ভোট।করবিনের এই জয় স্টার্মারের জন্য যেমন সতর্কবার্তা, তেমনই বামপন্থীদের জন্য একটি বড় শিক্ষা।

মূলত টোরি-বিরোধী ভোট থেকেই লেবারের এই সাফল্য।পার্টির ইতিহাসে সর্বনিম্ন ২৪ শতাংশের সমর্থন নিয়ে সংসদে টোরির আসন ১৮ শতাংশ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস-সহ ১১ জন মন্ত্রী হেরেছেন তাঁদের আসনে।মেগা শহরের কেন্দ্রগুলিতে গাজায় গণহত্যা ইস্যুতে লেবারের বিরোধিতা করে তাৎপর্যপূর্ণ জয় পেয়েছেন প্রার্থীরা। লেবারের প্রার্থীকে হারিয়ে জিতেছেন চারজন প্যালেস্তিনীয়পন্থী প্রার্থী। লেবার সবচেয়ে বেশি ফায়দা তুলেছে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি)-র বিপর্যয় থেকে। স্কটল্যান্ডে দলের ভোট বেড়েছে ১৭ শতাংশ, যেখানে এসএনপি-র ভোট পড়েছে ১৫ শতাংশ। লেবারের কাছে হারিয়েছে প্রায় চল্লিশটি আসন। এসএনপি-র আসন সংখ্যা ৪৮ থেকে কমে হয়েছে ৯।

এই প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন কট্টরপন্থী দল রিফর্ম ইউকে'র প্রধান নাইজেল ফারাজে।সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর দলের চারজন। সমর্থনের হার ১৪ শতাংশ। কনজারভেটিভ ভোটের একটি বড় অংশ কেটে নিয়েছে ফারাজের রিফর্ম পার্টি। যদি তা না হতো, তবে ফলাফল হতো অন্যরকম, রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি।এবারে ৯৮টি আসনে রিফর্ম পার্টি দ্বিতীয় স্থানে। টোরিকে হারিয়ে ফারাজের দল এভাবেই পুরস্কার তুলে দিয়েছে লেবারকে।

১২ শতাংশ ভোট পেয়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের আসন সংখ্যা এগারো থেকে ছ'গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৭১। গ্রিনদের আসন সংখ্যা ১ থেকে বেড়ে হয়েছে চার।

এই জনাদেশ সরকারের নীতির প্রতি এক জোরালো প্রত্যাখ্যান। বামপন্থীদের দৃষ্টি এখন অবধারিতভাবে হওয়া র উচিত সরকারি নীতির অভিমুখ পরিবর্তনের দিকে। জরুরি হলো ধর্মঘট-বিরোধী আইন, প্রতিবাদ-বিরোধী আইন-সহ কর্তৃত্ববাদী আইনগুলির পরিবর্তন, প্রকৃত আয় ২০০-বছরের নিচে নেমে যাওয়ার অধোগতির অবসান এবং মুখ থুবড়ে পড়া জনপরিষেবার পুনরুজ্জীবন। খুব বেশি না হলেও, এর মধ্যে কয়েকটি লেবারের কর্মসূচিতেও রয়েছে, যারা জিতে এসেছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। বামপন্থীদের তাই প্রথম দিন থেকেই সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে। শুধু ইউনিয়ন-বিরোধী আইনের অবসান এবং শ্রমিকদের অধিকার বাড়ানোর জন্য ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যই নয়, ভাঙতে হবে টোরির ব্যয়বরাদ্দের শৃঙ্খলাকে। যা স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও স্থানীয় প্রশাসন-সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সংকট সমাধানে মূল বাধা।

ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে টোরিদের এই পরাজয় স্বাগত। কিন্তু স্টার্মারের দক্ষিণপন্থী লেবার সরকার সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির কোনও মোহ থাকা উচিত নয়।

ব্যয়সঙ্কোচ, বেসরকারিকরণ, অভিবাসন, প্যালেস্তাইন, ইউক্রেন এবং ক্রমবর্ধমান সমরবাদের মতো; শ্রমজীবী জনগণ যে মৌলিক প্রশ্নগুলির মুখোমুখি; সেব্যাপারে প্রতিষ্ঠানপন্থী রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র ও মনোপলি মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে প্রায় সার্বিক ঐক্য।নির্বাচনের এই ফলাফল তেমন কোনও কিছুরই

সমাধান করবে না। বহু ক্ষেত্রেই টোরি সরকারের কলঙ্কিত নীতির ধারাবাহিকতা জারি রাখবে স্টার্মারের দক্ষিণপন্থী লেবার সরকার।

দুনিয়া জানে গাজার সঙ্কট নিয়ে কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাব দেননি স্টার্মার। বরং, প্যালেস্তাইনের গণহত্যা শুরুর গত ন'মাসে প্রতিটি পর্যায়ে টোরিদের সঙ্গে লেবার নিয়েছে অভিন্ন অবস্থান। এমনকি ওয়াশিংটনের সবুজ সংকেত দেওয়ার আগে পর্যন্ত সংঘর্ষ বিরতির ডাক দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করে। অস্বীকার করে ইজরায়েলকে সমরাস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার দাবি তুলতে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বয়কট বা নিষেধাজ্ঞার যে কোনও দাবির বিরোধিতা করে।

বৃহৎ শিল্পের শক্তিশালী অংশের মদতে স্টার্মার সরকার এবার দ্রুততার সঙ্গে শিল্পে শ্রমিকদের জঙ্গিপনা, শ্রেণিসংগ্রামকে নিকেশ করার চেষ্টা করবে। পাশাপাশি, সম্প্রতি দেখা দেওয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে দমন করবে।

শেষ ক'দিন স্টার্মারের লেবার পার্টি শুধু একটাই কথা বলেছে পরিবর্তন। যে স্লোগান দিয়ে একসময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বারাক ওবামা, যে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল ২০১১-র বাংলায়! ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বোঝাপড়া স্পষ্ট এই 'পরিবর্তন' হবে শুধু পুঁজিবাদ ও শাসকশ্রেণির সম্পদ রক্ষায় 'প্রহরীর' পরিবর্তন। সেকারণে স্টার্মারের জয় কোনওভাবেই শ্রমিকশ্রেণির জন্য অর্থপূর্ণ জয় হতে পারে না।

ঠিক এই কারণেই কোনও মোহ না রেখে রাস্তায় নামা ছাড়া বামপন্থীদের সামনে অন্য কোনও বিকল্প নেই। আর মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে নিবিড় সংযোগ। যেমন নর্থ ইসলিংটনে গড়ে তুলেছেন জেরিমি করবিন। তাকে লালন করে চলতে হবে।

'মার্কসবাদী পথ' থেকে সংগৃহীত।

নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে নয়া পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচি

প্রভাত পট্টনায়ক

আজ ফ্রান্স চূড়ান্ত দফার নির্বাচনে। নব্য ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় কমিউনিস্টরা-সহ একজোট বামপন্থীর। গড়েছেন নয়া পপুলার ফ্রন্ট। উপস্থিত করেছেন একটি সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মসূচি, যা সর্বতোভাবে নয়া উদারবাদের বিরোধী শুধু নয়, বরং পুরোদস্তুর নতুন এবং আগ্রহ-উদ্দীপক। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, বিশেষ করে এই ব্যাপারটা উন্নত অর্থনীতিতে ঘটছে বলে, ভাবনার যুদ্ধে এই কর্মসূচি এক নতুন শুরুর ইঙ্গিত বহন করছে।

ফ্রান্সের নির্বাচনে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচনে উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থানকে সাহায্য করার জন্য সুন্দর দৃশ্যপট নির্মাণ করেছেন। আর, বামপন্থী চারটি দল, কমিউনিস্টরা, সোশ্যালিস্টরা, গ্রিন পার্টি, আর জ্যাঁ লুক মেলেশোঁর দল আনবোড ফ্রান্স; সকলে মিলে নয়া পপুলার ফ্রন্ট বানিয়ে মেরিন লে পেনের ছুঁড়ে দেওয়া ফ্যাসিবাদী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।

এই অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। নয়া পপুলার ফ্রন্ট মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৩০ সালে ইউরোপ জুড়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে শক্তিশালী হতে থাকা, বিশেষ করে জার্মানি দখল করে ফেলা ফ্যাসিবাদের প্রেক্ষাপটে, ফ্রান্সে তৈরি হওয়া পপুলার ফ্রন্টকে। ম্যাক্রোঁ সোজাসুজি নয়া উদারবাদী। তাঁর সমর্থন পাওয়ার সম্ভবনা খুবই কম এ মুহূর্তে। পাশাপাশি আছেন উগ্র দক্ষিণপন্থীরা, যাঁরা তাঁদের নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই অর্থনৈতিক বিষয়ে অস্পষ্ট; তাঁরা সঠিক সময়ে একচেটিয়া পুঁজির সাথে খোলামেলা বোঝাপড়া করবার আগে এখন কিছুটা নিমরাজি হয়ে বড় ব্যবসাগুলোকে সাহায্য করবেন

বলছেন। অন্যদিকে নয়া পপুলার ফ্রন্ট উপস্থিত হয়েছে স্পষ্টতই বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে। একথা ঠিক তাঁদের ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়ে মার্কিন বক্তব্য সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে নেওয়ার সুবাদে মেনে নিতে হচ্ছে, মেলেশোঁর গাজা গণহত্যা বিষয়ক অবস্থানও মানতে হবে, তবুও নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান খুবই স্পষ্ট।

তাঁদের কর্মসূচি বলছে মাস মাইনের বৃদ্ধির কথা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও তেলের দাম বৃদ্ধিতে লাগাম দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা, ম্যাক্রোঁর অবসরের বয়সসীমা ৬৪ করার প্রস্তাব বাতিলের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা, কারণ সরকারের পেনশন খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেড়ে যাবে। মূলতঃ তাঁরা বলছেন পরিবেশ-বান্ধব পরিবর্তনের স্বার্থে ও জনগণের সাহায্যার্থে লগ্নির কথা। এই কর্মসূচি পালন করতে কত খরচ হতে পারে সে হিসাব নয়া পপুলার ফ্রন্ট ইতোমধ্যেই করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারা অনুমোদিত কোষাগারীয় ঘাটতির পরিমাণ না বাড়িয়ে, বরং বাড়তি লাভবান হচ্ছে এমন কোম্পানির উপর ট্যাক্স চাপানোর পক্ষপাতী তাঁরা, চাইছেন, ম্যাক্রোঁর বন্ধ করে দেওয়া সম্পদ-কর আরেকবার চালু করতে। এঁরা বলছেন ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অসংখ্য ছিদ্র বন্ধ করতে আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের একটা উর্ধ্বসীমা রাখতে, যাতে বাড়তি অংশটুকু অন্তত সরকার পেতে পারে।

এইসমস্ত দাবিই এত বছর ধরে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা প্রস্তাব করে আসছে এবং মূল ধারার সংবাদমাধ্যমগুলো শুধু ফ্রান্সে নয়, বিশ্বজুড়ে, এমনকি ভারতেও যা প্রচার করে আসছে, তার সরাসরি বিরোধী। যখন প্রস্তাব উঠেছিল সবদেশই নিদেনপক্ষে২৫ শতাংশ কর কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর উপর চাপাক, যাতে বিভিন্ন কর-কাঠামোর সুযোগ নিয়ে পুঁজি দেশান্তরে যাত্রা করতে না পারে, তখন বেশিরভাগ সরকারই বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির দাসত্ব করার জন্য হয় এ প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা করে না হলে গয়ংগচ্ছ নীতি গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছিল ১৫ শতাংশ কর চাপানোর, ঘটনাক্রমে সেটা যদিও বেশিরভাগ দেশের আগে থেকেই কার্যকর কর্পোরেট করহারের চেয়ে কম, এই প্রসঙ্গেই বাড়তি লাভবান কোম্পানির উপর কর চাপানোর প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্য অর্জনকরেছে। পাশাপাশি, সাধারণভাবে সম্পদ-কর প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েই থাকে, কারণ কর চাপানো কঠিন আর যে রাজস্ব পাওয়া যায় তা কর চাপানোর খরচের চেয়ে কম। এই যুক্তিতেই ভারতেও যে সম্পদ-কর আগে কার্যকর ছিল তা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল। গড়িমসি করে সম্পদ-কর চাপানো আর কম রাজস্ব পাওয়া; সম্পদ-কর প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য দেওয়া অপযুক্তি ছাড়া কিছু নয়। নয়া পপুলার ফ্রন্ট এই মিথ্যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এবং তাঁরা সম্পদ-কর পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করছেন।

অন্যান্য সব রাজনৈতিক পক্ষও সম্প্রতি সম্পদ-কর কার্যকর করার দাবি করেছে, বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য। আমেরিকার শেষ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির দু'জন বার্নি স্যাণ্ডার্স এবং এলিজাবেথ ওয়ারেন এই দাবি করেন, কিন্তু মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেহেতু ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে তাদের মনোনয়নই গ্রহণ করেনি, সেকারণে তাদের প্রস্তাব সংসদীয় স্তরেই থেকে যায়। খুব সম্প্রতি, বিশ্ব অসাম্য তথ্যসম্ভারের সঙ্গে যুক্ত ফরাসী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি ভারতে সম্পদের অসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ-কর পুনরায় চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যে দাবি বামপন্থী দলগুলো ঢের আগে থেকেই জানিয়ে আসছে।

পাশাপাশি, নয়া পপুলার ফ্রন্টের দাবি হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের উপর ট্যাক্স বসানো, যা যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজেই থাকা উচিত। সত্যি বলতে কী, এ ধরণের কর বিশেষ কোনো গুণাবলীর জন্য প্রাপ্ত অর্জন হিসাবে লভ্যাংশকে বুঝবার পুঁজিবাদী দর্শনের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ, যা উত্তরাধিকার সূত্রে না পাওয়াই উচিত বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের কর সংক্রান্ত

আইন আলাদাভাবে থাকতে পারে, ঠিকই, কিন্তু এটি সম্পদ করের একটি দরকারি সংযোজন'ও বটে। এদেশে যখন একজন পরিচিত কংগ্রেসী উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ-কর চালু করার দাবি জানান (বামপন্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে যে কথা বলে আসছে), কোনও সংবাদ সংস্থা দেখায়নি যে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্ভব হলে প্রায় তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রস্তাবটিকে সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিবাদী কায়দায় দুমড়ে মুচড়ে দাবি করেছিলেন যে কংগ্রেস আসলে হিন্দু মহিলাদের গয়না নাকি মুসলমানদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়। নয়া পপুলার ফ্রন্ট সত্যি বলতে কী শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে কর নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করছে, সে বিষয়টি এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একই বিষয় বলা চলে জনস্বার্থে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি সম্পর্কেও। আমরা নিজেদের দেশেও দেখছি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়ার বিষময় ফলাফল। এসব অবশ্যই নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের দাবির প্রতি সমর্থনসূচক পদক্ষেপ, যার ফলে এসব পরিষেবা অকারণে মহার্ঘ হয়ে গেছে। বস্তুত, কৃষকদের ঋণগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার এবং ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করার এক মুখ্য কারণ দেখা যায় হঠাৎ ঘাড়ে চাপা বিপুল স্বাস্থ্য খরচ।

অন্যদিকে, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে লাগাম টানা আসলে মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জরিত জনতাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা। এই প্রস্তাব আসলে পুঁজিবাদী রক্ষণশীলতা যা আর্থিক ও কোষাগারীয় নীতির সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করে, তা সম্পূর্ণত ভেঙে বেরিয়ে আসার পথ। এইসব নীতি অর্থনীতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। বর্ধিত বেকারত্বই মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র সমাধান বলে পুঁজিবাদ মনে করে। বেকারত্ব বাড়ানোর চেয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ করা মুদ্রাস্ফীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সমাধান। অতীতে ভারতের মাটিতে এসব কথা বামপন্থীরা বারবার বলেছেন, এখন ঘটনাচক্রে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তির কর্মসূচিতে এসব দাবি স্থান পাচ্ছে।

দশকের পর দশক ধরে বিশ্বায়িত পুঁজির মুখপাত্রেরা আবর্জনা ছড়িয়েছেন, দাবি করে গেছেন এই ময়লা ছড়ানো ছাড়া আর নাকি উপায়ান্তর নেই। বিপরীতে নয়া পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচি নিয়ে এসেছে দমকা বাতাস। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ফ্রান্সের বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম এবং একদল রাজনীতিবিদ; একেবারে নয়া উদারবাদী থেকে উগ্র দক্ষিণপন্থী পর্যন্ত সকলেই; নয়া পপুলার ফ্রন্টের অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে খুব সমালোচনা শানাচ্ছেন; ফ্রান্সের অর্থনীতি নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করলে; এসব ভয় তাঁরা মানুষকে দেখাচ্ছেন। তারপরেও, নয়া পপুলার ফ্রন্ট এখনো পর্যন্ত জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বেশ ভালো অবস্থানেই আছে। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা ৩১ শতাংশ জনসমর্থন পেলে নয়া পপুলার ফ্রন্ট ২৬-২৮ শতাংশ জনসমর্থন পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ম্যাক্রোঁ'র পার্টি ২০ শতাংশ জনসমর্থনের নিচে নেমে যাবে।

ফ্রান্সের বামপন্থীরা যে নিজেদের মধ্যেকার মতামতের পার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে, ফ্যাসিবাদকে হারাতে নেমেছেন, সেটা স্বাগত জানান উচিত। স্যোশাল ডেমোক্র্যাট নেতা গ্লুকসম্যান, জ্যাঁ লুক মেলেশোঁর বিরুদ্ধে তাঁর বহুকালের তিক্ততা সরিয়ে রেখে নয়া পপুলার ফ্রন্ট'কে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে মেলেশোঁ কথা দিয়েছেন যে যদি নয়া পপুলার ফ্রন্ট জয়ী হয়, এবং অন্যরা যদি না চায়, সেক্ষেত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন না। ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া এবং মতাদর্শগত পার্থক্যগুলো সরিয়ে রেখে নয়া পপুলার ফ্রন্ট যেভাবে উগ্র দক্ষিণপন্থার ক্ষমতায় আসার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তা সত্যিই অনন্য।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এমন একটি সাধারণ অর্থনৈতিক কর্মসূচির গ্রহণ করা হয়েছে যেটি সর্বতোভাবে নয়া উদারবাদের বিরোধী শুধু নয়, বরং সম্পূর্ণতই নতুন এবং আগ্রহ-উদ্দীপক। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, বিশেষ করে ব্যাপারটা উন্নত অর্থনীতিতে ঘটছে বলে, ভাবনার যুদ্ধে এই কর্মসূচি এক নতুন শুরুর ইঙ্গিত বহন করছে।

ভাষান্তর নবারুণ চক্রবর্তী ('মার্কসবাদী পথ' - এ ৬ জুলাই প্রকাশিত)

ফ্রান্সে অতি দক্ষিণপন্থার বিপর্যয়

অর্ক ভাদুরী

পশ্চিম ইউরোপের অতিদক্ষিণপন্থার বিজয়রথের চাকা বসে গেল ফ্রান্সে। ফরাসী সংসদে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে উঠে এল বামপন্থীদের জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট। তারা পেয়েছে ১৮২টি আসন। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর মধ্য ডানপন্থী জোট এনসেম্বল দ্বিতীয় (১৬২ আসন)। উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএন) বিজয় সুনিশ্চিত বলে মনে করছিলেন অনেকে, ১৪৩টি আসন পেয়ে তাদের অবস্থান তৃতীয়।

ফ্রান্সে বামপন্থীদের দুর্দান্ত সাফল্যের প্রধান কাণ্ডারি জাঁ লুক মেলেশঁ। তাঁর দল 'লা ফ্রাখন্স ইন্সোমিসে' (LFI) নিউ পপুলার ফ্রন্টের প্রধান শরিক। এছাড়াও এই ফ্রন্টে আছে সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি (PCF) এবং ইকোলজিস্ট কোয়ালিশন। মেলেশঁকে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া 'অতি বামপন্থী' তকমা দেয়। অনেকে তাঁকে বলেন 'ফ্রান্সের জেরেমি করবিন'। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর মেলেশঁ জানিয়েছেন, নতুন সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া। বলা বাহুল্য, দুর্দান্ত সাফল্যের পর ব্রিটেন থেকে করবিন অভিনন্দন জানিয়েছেন ফরাসী বামপন্থীদের।

ফ্রান্সের শাসকশ্রেণি তার প্রধান দুশমনকে চিনতে ভুল করেনি। বহু বছর ধরেই মেলেশঁ এবং তাঁর দলবল তাদের চোখের বালি। লা পেনের অতিডানপন্থী ন্যাশনাল র‍্যালিই হোক বা প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর মধ্যপন্থী জোট এনসেম্বল- সকলেরই আক্রমণের প্রধান টার্গেট ছিলেন মেলেশঁ। এমনকি গতকালও ফলপ্রকাশের পরে এনসেম্বেলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, LFI যাতে ফ্রান্সকে অতিবামপন্থী বিশৃঙ্খলার দিকে না নিয়ে যেতে পারে, কোনও অতিবামপন্থী যাতে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনের আগেও এনসেম্বেলের নেতারা জানিয়েছিলেন, LFI বাদে অন্য বামপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে তাঁদের অসুবিধা নেই। পপুলার ফ্রন্টের মধ্যেও সবচেয়ে র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক শক্তি জ্রচজ্জ এবং তার নেতা মেলেশঁ। বহু 'বনেদি বামপন্থী' শক্তি যখন প্যালেস্টাইনের পক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করছিল, অনেক 'যদি', 'কিন্তু' 'তবু'-র আশ্রয় খুঁজছিল, তখন দ্বিধাহীন দৃঢ়তায় প্যালেস্টাইনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন মেলেশঁ এবং তাঁর কমরেডরা। এই কাজে ঝুঁকি ছিল। ভয়ংকর মিডিয়া সন্ত্রাস ছিল। ছিল মারাত্মক চরিত্রহনন, ব্যক্তিগত আক্রমণ, ইহুদিবিদ্বেষের মিথ্যে অভিযোগ। ভয় পাননি মেলেশঁ। তাঁরা রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারতেন। বিপুল শক্তিক্ষয় হতে পারত। কিন্তু মেলেশঁ বুকটান করে দাঁড়িয়েছেন সবকিছুর মুখোমুখি।

বামপন্থী জোট সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে ঠিকই, তবে ফ্রান্সে খেলা এখনও বাকি। ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্ট। রাস্তায় রাস্তায় অতিদক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের সংঘর্ষ। তার মাঝেই বিজয় উৎসবে উড়ছে প্যালেস্টাইনের পতাকা, কুর্দ বিপ্লবীদের নিশান। শোনা যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল। এই সবকিছুর মাঝে ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে ৭২ বছরের যুবক মেলেশঁর ছায়া। প্রধানমন্ত্রী যেই হোন, পপুলার ফ্রন্টের বাকি শরিকরা যাই করুন, মেলেশঁ থাকবেন রাজপথে, থাকবেন সংসদে- ফ্রান্সের নিপীড়িত জনতাকে নেতৃত্ব দেবেন আগামী সংগ্রামে।

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

বিপদ শিয়রে, বাতিল করো নতুন দণ্ডসংহিতা

---

১ জুলাই থেকে ভারতে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় শুরু হতে চলেছে নতুন তিন আইনের শাসন। এতদিন চালু ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসি'র বদলে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা (বিএনএস), ফৌজদারি কার্যবিধি বা সিআরপিসি'র বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ) চালু হচ্ছে গোটা দেশে। হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের আধিপত্যবাদ নামকরণের ভাষাসন্ত্রাসে স্পষ্ট। বৈচিত্র্যের ভারতকে মুছে ফেলার অবিরাম অপপ্রয়াসেরই আরও এক নজির। গত ডিসেম্বরে প্রায় বিরোধীশূন্য সংসদে কার্যত আলোচনা ছাড়াই পাশ করানো হয়েছিল তিন বিল। ২৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর পেয়ে আইন হয়ে যায়। এর পর লোকসভা ভোটের অপেক্ষাও না-করে নরেন্দ্র মোদী- অমিত শাহরা ঘোষণা করে দেন, ১ জুলাই চালু হয়ে যাবে নতুন তিন আইন (একত্রে

'দণ্ডসংহিতা' বলা আলোচনার সুবিধায়)। বিস্তারিত মতামত গ্রহণ, পর্যালোচনার তোয়াক্কা না-করেই তুমুল তাড়াহুড়োয় বিল তৈরি থেকে আইন পাশ হয়েছে। অথচ ১৯৪৭-এর পর অন্তত ৭৫ বার আইপিসি সংশোধিত হয়েছে বিস্তারিত আলোচনা করেই। সিআরপিসি'ও ঠিক ব্রিটিশের নয়, ১৯৭৩ সালের। নতুন আইন আনার নেপথ্যে যদি নাগরিক স্বাধীনতা মজবুত করার কথা ভাবা হত, নাগরিকের হয়রানি কমানো ও ন্যায়বিচারের পথ সুগম করার বন্দোবস্ত থাকত-স্বাগত জানানোই যেত। কিন্তু দণ্ডসংহিতায় ঘটছে উল্টোটাই। উপনিবেশের চিহ্ন মোছার নামে কঠোর নিদানে নাগরিকের স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্র বড় নগ্ন। নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার আরও বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা যে কতখানি-নতুন আইনের কয়েকটি মাত্র ধারা পর্যালোচনাতেই স্পষ্ট

বিএনএসএস ১৮৭ ধারা। এত দিন গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কাউকে সর্বোচ্চ ১৪ দিন নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারত পুলিশ। সেটা বদলে ৬০ কিংবা ৯০ দিন অবধি পুলিশ হেফজাতের নিদান হয়েছে। হেফাজতে অত্যাচার, নৃশংসতা বাড়ার আশঙ্কা প্রবল।

বিএনএসএস ৫৩। পুলিশ হেফাজতে থাকা বন্দির প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষাও বাতিল! একবার দেখার পর ডাক্তার মনে করলে তবেই ফের পরীক্ষা (পুলিশের ইঙ্গিতে কী হতে পারে, ভেবে নিন)। রেজিস্টারে জিজ্ঞাসাবাদকারী পুলিশ অফিসারের নাম নথিভুক্তির ব্যবস্থা বাতিল ডিকে বসু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করেই। অ্যারেস্ট মেমোয় সময়, স্থান লেখার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও উধাও।

বিএনএসএস ১৭২। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে না-হাজির করিয়েই ২৪ ঘণ্টা অবধি নাগরিককে আটকে রাখার (ডিটেনশন) সুযোগ পুলিশের হাতে!

বিএনএসএস ৩৭। বিচারের ঢের আগে তদন্ত-পর্বেই বন্দি অভিযুক্ত সম্পর্কে পুলিশ ছবি-সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারে নাগরিকের মানবিক মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে। বিচারে অভিযোগ ভুল প্রমাণ হলে ফিরে কি পাওয়া যাবে সামাজিক সম্মান? পুলিশের শাস্তিরও সংস্থান নেই।

বিএনএসএস ৪৩(৩)। অভিযুক্তকে হ্যান্ডকাফ পরানোর মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা অবাধ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায় অগ্রাহ্য করেই।

বিএনএসএস ১০৭। তদন্ত চলা অবস্থাতেই কারও কোনও সম্পত্তি 'অপরাধের সূত্রে প্রাপ্ত' বলে পুলিশের মনে হলে কোর্টের অনুমতি নিয়ে তা বাজেয়াপ্ত করা যাবে। জেলাশাসকের মাধ্যমে বিলি-বণ্টনও করে ফেলা যাবে! মনে রাখুন, এটা ঘটবে তদন্ত-পর্বে, বিচারে অপরাধ প্রমাণের আগেই।

বিএনএসএস ৪৯৭। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ছবি তুলে ১৫-৪৫ দিনের মধ্যে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট বিচার শেষের আগেই!

শুধুমাত্র প্রথম বার অভিযুক্ত বন্দিরাই সে সুযোগ পাবেন। ফলে বিচার শেষের আগেই বন্দি হয়ে থাকার মেয়াদ আরও লম্বা হবে অনেকের, বিচারাধীন বন্দির ভিড়ে উপচে পড়বে জেলখানা। যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ড হতে পারে এমন মামলায় বিচারাধীন বন্দি ডিফল্ট বেল চাইতেই পারবেন না! অথচ হয়তো বিচার শেষে দেখা যাবে বেকসুর, ততদিনে জেলেই কেটে গিয়েছে ১৪/১৫ বছর। বিনা দোষে লম্বা জেল খাটতে হলেও নাগরিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কিন্তু সুযোগ নেই!

বিএনএসএস ৩৩০। তদন্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট নেওয়া হলেও বিচার-পর্বে সেই এক্সপার্টদের সাক্ষ্যদানে নাও ডাকা হতে পারে! অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের অন্যতম উপায় সাক্ষীদের জেরার যে সুযোগ, সেটুকুও সঙ্কুচিত হল।

বিএনএসএস ৩৪৯। ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হলে কোনও ঘটনায় 'তদন্তের স্বার্থে' যে কোনও নাগরিককে ফিঙ্গার প্রিন্ট এবং ভয়েস স্যাম্পেল দিতে বাধ্য করা যাবে সেই নাগরিক কোনও মামলায় অভিযুক্ত না- হলেও! মানে নাগরিক মাত্রই সন্দেহভাজন?

বিএনএসএস ৩৫৬। বিচার-পর্বে 'পলাতক' হলে অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতেই হয়ে যাবে বিচার, এমনই একুশে আইন!

বিএনএসএস ৪৭২। মৃত্যুদণ্ডের সাজায় রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আবেদন এক বার নাকচ করে দিলে আদালতে সুবিচার চাওয়াও যাবে না!

বিএনএসএস ১৭৩। নাগরিক অভিযোগ জানাতে গেলে থানা নিতে বাধ্য - এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। যে অপরাধ নিয়ে অভিযোগ, তা যদি ৩ থেকে ৭ বছর সাজাযোগ্য হয় তবে পুলিশ আগে অনুসন্ধান করবে, সন্তুষ্ট হলে তবে এফআইআর। মানে পুলিশের মর্জির উপরে নির্ভর

করতে হবে।

বিএনএসএস ১৭৩ (৩), ১৭৫ (৩, ৪), ২২৩। অভিযোগ জানানোর অন্যতম বিকল্প পথ ছিল ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হওয়া। অভিযোগকারী এবং তাঁর তরফে সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে তবেই ম্যাজিস্ট্রেট মামলা গ্রহণ করতেন। নতুন ব্যবস্থায় অভিযোগ যদি পুলিশ বা কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে হয়, ম্যাজিস্ট্রেটকে আগে শুনতে হবে অভিযুক্ত এবং তাঁর বসের বক্তব্য। তাঁদের ব্যাখ্যা শোনার পর ম্যাজিস্ট্রেট মামলা অগ্রাহ্য করতে পারেন (অভিজ্ঞতা বলে, সেই সম্ভাবনা প্রবল। অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিলই বিচার-পর্বে, কিন্তু অভিযোগ জানানোর সময়েই বাধা তৈরি করা হল)।

বিএনএসএস ৪৭৯। লম্বা সময় বিচারাধীন বন্দি কেউ সম্ভাব্য সাজার মেয়াদের অর্ধেক পেরোলেই ডিফল্ট বেল (জামিন) পেতে পারতেন ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৬ (এ) ধারায়। বিচারে বিলম্বে নাগরিকের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হওয়া প্রতিরোধের উপায় ছিল এটা।

বিএনএসএস ৫৩০। ভার্চুয়াল ট্রায়াল, ভিডিয়ো - মাধ্যমে বিচার চলতে পারে। ফলে অভিযুক্তের আইনজীবী ভালো করে জেরাই করতে পারবেন না সাক্ষীদের। জেরা-পর্বে সাক্ষীর শরীরী ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। বোঝার উপায় থাকবে না। ন্যায়বিচারও আকাশকুসুম হবে (এভিডেন্স অ্যাক্টের বদলে আনা বিএসএ বা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মেও মূল পরিবর্তনটা টেকনোলজি ব্যবহারে বিপুল গুরুত্ব আরোপে। মামলার নথি ইমেলে দিয়েই দায়িত্ব সারা হতে পারে [বিএসএ ২(১)(ডি)]।

বিএনএস বা ভারতীয় ন্যায়সংহিতা

নয়া দণ্ডবিধির মূল বৈশিষ্ট্যই সাজা ও জরিমানা বৃদ্ধি। ৩৩টি ক্ষেত্রে কারাবাসের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ৬ মাস বেড়ে ১ বা ২ বছর, ২ বছর বেড়ে ৩ বা ৫ বছর, ৩ বছর বেড়ে ৫ বা ৭ বছর, ৭ বছর বেড়ে ১০ বছর, ১০ বছর বেড়ে ১৪ বছর করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন মানে হয়েছে আমৃত্যু কারাবাস। তা হলে জেলের সংশোধনাগার নামের কী গুরুত্ব রইল, সে প্রশ্ন থাকছে। ১৪ বছর কারাবাসের পর বন্দির আচার-আচরণ বিবেচনা করে রেমিশন এবং মুক্তির যে সুযোগ ছিল, তা কেড়ে নেওয়া হল। মারা যাওয়া অবধি ঠিকানা জেলখানাই! ৮৩টি ক্ষেত্রে জরিমানাও বিপুল বাড়ানো হয়েছে, বৃদ্ধির হার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১০০০ শতাংশ! মৃত্যুদণ্ড বিলোপের বদলে আগের ১১টি ক্ষেত্র থেকে বেড়ে ১৫টি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান হয়েছে। সংবিধানের ১৪,২১অনুচ্ছেদে বিধৃত মৌলিক অধিকার পদ পদে পদপিষ্ট নতুন ন্যায়সংহিতায়। পরোয়া করা হয়নি সুপ্রিম কোর্টের নানা নির্দেশেরও। ন্যায়বিচারের প্রাথমিক শর্ত, অভিযুক্তকে নির্দোষ ধরেই বিচারে এগোনো। ন্যায়সংহিতায় অভিযুক্তকে অপরাধী ঠাউরে নেওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট।

বিএনএস ১১১। 'সংগঠিত অপরাধ'-এর মতো বিশেষ ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাধারণ দণ্ডবিধিতে। অথচ যে কোনও অপরাধে দণ্ডদানের সংস্থান সাধারণ বিধিতেই রয়েছে। বরং নতুন ব্যবস্থায় আরও কঠোর করা হয়েছে। তার পরেও গুজরাট মডেলে সংগঠিত অপরাধের কুখ্যাত বিশেষ আইন এ বার চলে এল সাধারণ ন্যায়সংহিতায়! সাজা হতে পারে সর্বোচ্চ, মৃত্যুদণ্ড।

বিএনএস ১১৩। দানবীয় ইউএপিএ-র ১৫ ধারার হুবহু নকল। 'বিশেষ আইন' ইউএপিএ থাকছেই। ইউএপিএ-র ধারায় মামলা হতে হলে অনুমোদন দিতে হয় তদন্তকারী পুলিশের বাইরে সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ পদাধিকারীকে। ন্যায়সংহিতার ধারায় বকলমে ইউএপিএ-তে মামলা করতে পারেন থানার এসআই, অনুমোদন দেবেন তাঁর বস, পুলিশ সুপার! অনুমোদন প্রায় অবধারিত। কার্যত অভিযুক্তেরই দায় নির্দোষ প্রমাণের।সাজা হতে পারে মৃত্যুদণ্ড।

বিএনএস ১৫২। রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারা সুপ্রিম কোর্ট স্থগিত করে দিয়েছিল। ন্যায়সংহিতা নিয়ে ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নতুন বিধিতে রাষ্ট্রদ্রোহ থাকছে না। ডাহা মিথ্যা। পুরোপুরি থাকছে, আরও কঠোর বন্দোবস্তে। আরও অস্পষ্ট ব্যাখ্যায়। কথা- ছবিতে কারও ভাবপ্রকাশ সরকারের অপছন্দের হলে (উত্তেজনা ছড়াতে পারে মনে হলেই) হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

বিএনএস ১৯৭ (১) (ডি)। 'মিথ্যা' তথ্য প্রকাশ, পরিবেশনে ৩ বছর অবধি কারাবাস এবং জরিমানা। কোনটা মিথ্যা, কে না জানে সেটা সরকারের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার! বিভিন্ন পোর্টাল, ইউটিউবের মতো সমাজমাধ্যমে সরকারের বহুবিধ ব্যর্থতা, প্রতারণা, কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস

রুখতেই কি এই সাজার সংস্থান? সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত নাগরিকের মতাপ্রকাশের অধিকার খর্বের সচতুর বন্দোবস্ত।

বিএনএস ২২৬। গান্ধীর দেশে এ বার থেকে সরকারের নিষেধ না- মেনে কোনও বিষয়ের প্রতিবাদে অনশন করলেও হতে পারে কারাদণ্ড! (অনুমতি নিয়ে কেই বা কবে অনশন করেছেন?)

বিএনএস ২৩। বলা হচ্ছে, জেল-জরিমানার বদলে বিনা পারিশ্রমিকে কমিউনিটি সার্ভিসের সাজা প্রচলন নাকি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। অথচ কোনটা কমিউনিটি সার্ভিস, তা-ই অনির্দিষ্ট। সরকারের খিদমত খাটা, ধর্মস্থানে সেবাদানই কি হবে ভবিতব্য?

বিএনএস ১১। বহু ক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্তের সলিটারি কনফাইনমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ১৯৭৯ সালের সুবিখ্যাত সুনীল বাত্রা মামলার রায় উপেক্ষা করেই এই গ্যাস-চেম্বার সুলভ বন্দোবস্ত। ব্রিটিশের ব্যবস্থায় থাকা রক্ষাকবচও উধাও। উপনিবেশের নাম-নিশান মেটানোর নামে এটা কি আসলে নয় নয়া-উপনিবেশবাদ?

আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না-সময়ের দাবি ছিল এই। ২০১৪-য় সুপ্রিম কোর্টের অরনেশ কুমার রায়ের প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলার ব্যবস্থাও নেই নতুন দণ্ডসংহিতায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পুলিশ আর তদন্তের জন্যে পুলিশের দু'টি পৃথক বিভাগের প্রস্তাব বহু দিনের। তদন্ত বিভাগকে সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে আদালতের অধীন করার দাবিও রয়েছে। সেই সব জরুরি পরিবর্তনের কোনও বালাই নেই। কোর্টের সংখ্যা বাড়ানো, পর্যাপ্ত বিচারক-বিচারপতি এবং আদালত-কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনও উপেক্ষিত। তবে নতুন আইনে সামারি ট্রায়ালে (ক্যাঙারু কোর্ট? বিএনএসএস ২৮৩) বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে! ন্যায়বিচার ধারণাটাকে যথাসম্ভব গলা টিপে মারার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভেবে দেখুন, এই পুলিশ রাষ্ট্র কি চাই আমরা? দেশটা আস্ত আর মস্ত এক জেলখানা হোক, চাই কি? না-চাইলে প্রতিবাদ করুন, নতুন দণ্ডসংহিতা বাতিলে বাধ্য করুন সরকারকে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) ২৫ জুন ২০২৪
এপিডিআর সরাসরি সদস্য সমন্বয়, থেকে পুঃন মুদ্রিত।

জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ

নন্দন রায়

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার গত দশ বছরে সংবিধান লঙ্ঘন করে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত সংসদে দেড় শতাধিক সাংসদকে সাসপেন্ড করে ন্যায় সংহিতা নামক জনবিরোধী ফৌজদারি বিধির প্রবর্তন করেছেন। এবার মোদীর উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বদলে দেওয়া। সেটা হয়নি। মোদী প্রায়শই ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলের জরুরি অবস্থার কথা বলে সংবিধান লঙ্ঘনের উদাহরণ দেন। ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২১ মাস পর তিনি জরুরি অবস্থা রদ করে নির্বাচন করান, কিন্তু পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। মোদী গত দশ বছর ধরে দেশে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করে রেখেছেন। সমস্ত স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা হরণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নন্দন রায়ের ২০০৮ সালে লিখিত প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রকাশ করলাম। এটি প্রথম কিস্তি।)

প্রায় সমস্ত আধুনিক সমাজে ফ্যাসিবাদী, আধা-ফ্যাসিবাদী, আদি-ফ্যাসিবাদী(proto-fascist) অথবা নয়া - ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সমাজের প্রান্তদেশে একটা ফেনোমেনন হিসেবে উপস্থিত থাকে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে

১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর্বে, অথবা এখন, যখন ২০০৮ সাল থেকে গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব এক অমোচনীয় অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত, তখন এই আন্দোলন সমাজের প্রান্তিকতা থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতির কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয় এবং বুর্জোয়া উদারবাদী ও বামপন্থী দলগুলিকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসে (যেমন ভারতে) অথবা ক্ষমতা দখলের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয় (যেমন ফান্সে)।

এই আন্দোলনগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই দক্ষিণপন্থী, শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে এবং গরিববিরোধী। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের আন্দোলনকে সাধারণ বুর্জোয়া দক্ষিণপন্থা অথবা অন্য কোনো দক্ষিণপন্থী আন্দোলন থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। দ্বিতীয় কথিত আন্দোলনগুলি, সন্দেহ নেই ফ্যাসিবাদের থেকে সামান্যই পৃথক, তবুও ফ্যাসিবাদের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষভাবে এবং আলাদা ভাবে বোঝা দরকার, তা নাহলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াইয়ের যে বিশেষ কৌশল অবলম্বনের কথা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি দিমিত্রভ সূত্রবদ্ধ করেছিলেন তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে। ২০১৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে হঠিয়ে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-আরএসএস চক্রের যে সরকার গত আট বছর ধরে রাজত্ব করে চলেছে, সেটা একটি বুর্জোয়া সরকারকে সরিয়ে আর একটি বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠার মতো সাধারণ ঘটনা নয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রই হল 'আর কোনো সরকার নয়'।

'জরুরি অবস্থা বনাম মোদীর জমানা' অনেক বামপন্থীদের ধারণা যে মোদীই প্রথম এদেশে ফ্যাসিবাদী জমানা প্রবর্তন করেননি। ইন্দিরা গান্ধির আমলে ১৯৭৫-৭৭ সালে যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, সেটাই ছিল এদেশে ফ্যসিবাদী নিপীড়নের প্রথম পদক্ষেপ। এখনও সেই সময়কে বলা হয় 'আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস'। আধা-ফ্যাসিবাদ বলে যে কিছু হয় তেমন কোনো ধারণা মার্কবাদী সাহিত্যে আমি খুঁজে পাইনি। ফ্যাসিবাদ আদতে 'ফ্যাসিবাদ'ই-এর 'আধা' বা 'পুরো' হয়না। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে জার্মানির ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আজকের ভারতে মোদীর ফ্যাসিবাদকে একই আসনে বসালে আবার একটা ভুল হবে। দিমিত্রভের বক্তৃতায় বলা হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফ্যাসিবাদ কী রূপ পরিগ্রহ করবে সেটা সেই দেশের ইতিহাস, সামাজিক শক্তিগুলির বিন্যাস এবং নির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির ওপরে নির্ভর করবে। ফলে ১৯৩০-এর দশকের চশমা পরে আজকের ভারতের ফ্যাসিবাদের চরিত্র নির্ধারণ করা যায় না। আজকের ভারতের ফ্যাসিবাদকে বুঝতে হলে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির দুনিয়া জোড়া আধিপত্য (যার ফলে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি প্রশমিত হয়ে গিয়েছে) এবং এদেশের সামাজিক অসাম্যের সহস্র বছরের ইতিহাস মাথায় রাখতে হবে।

মাথায় রাখতে হবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের এক অনন্য (unique) অংশগ্রহণমূলক (inclusive) জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কথা, যা ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের থেকে চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি। বরং একবিংশ শতাব্দীর এই ফ্যাসিবাদকে আমরা 'নয়া ফ্যাসিবাদ' বলতে পারি যাতে জার্মানির ফ্যাসিবাদের থেকে একে আলাদা করে চেনা যায়। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন কালে ফ্যাসিবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিছুটা আলাদা রূপ পরিগ্রহ করলেও ফ্যাসিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি অভিন্নই থাকে। নইলে তাকে আমরা ফ্যাসিবাদ বলে অভিহিত করব কেন?

সন্দেহ নেই যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, চারপাশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টিকরা এইসব দিক দিয়ে দেখলে জরুরি অবস্থার সঙ্গে মোদী জমানার একটা আপাত সাদৃশ্য আছে এটা চোখে পড়ে। কিন্তু এটুকুই। জরুরি অবস্থার সঙ্গে মোদী-জমানার অমিলের ভাগটাই বেশি আর অমিলগুলির দিক দিয়ে জরুরি অবস্থার থেকে মোদীর রাজত্ব অনেক বেশি নেতিবাচক ও ভয়ংকর ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে।

এখানে একটা সংযোজন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি কারণ এই রচনা যে কতিপয় মানুষ পড়বেন, তারা বঙ্গবাসী। ১৯৭২-৭৭ সময়কালে এ রাজ্যে যে সন্ত্রাস সংগঠিত হয়েছিল সেটা কেবল জরুরি অবস্থার কারণে হয়নি। সিদ্ধার্থশংকর রায় জোর জবরদস্তি করে ১৯৭২ এর নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় বসার আগে থেকেই সারা রাজ্য জুড়ে কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবি শ্রেণিগুলির এক তীব্র

শ্রেণিসংগ্রাম চলছিল যা ছিল গণউন্মাদনায় ভরপুর এবং প্রায়শই রক্তক্ষয়ী। আবার বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে তীব্র আন্ত পার্টি সংঘর্ষও চলছিল সামাজিক প্রভুত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কে কায়েমি স্বার্থ মরিয়া সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছিল যার মদতদাতা ছিল খোদ রাষ্ট্রশক্তি। ফলে অভিঘাতের বিচারে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে জরুরি অবস্থা জারির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। প্রথমত, জরুরি অবস্থার সময়ে রাষ্ট্র নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করত, চাপও সৃষ্টি করত নানান ধরনের। কিন্তু এখন জনগণকে জোর করে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি জাতীয়তাবাদের সবক শেখানোর দায়িত্ব নিয়ে পথে নামা ভীতির সঞ্চারকারী মারমুখী গুন্ডাদের তখন দেখা যায়নি। সরকারের সমালোচনাকারী যে-কোনো মানুষকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার মতো গেরুয়া ফেট্টিধারী গুন্ডাদের পথেঘাটে তখন দেখা যায়নি। সমালোচনা করার অপরাধে অধ্যাপককে রাস্তায় হাঁটু মুড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করার এমন ধিক্কারজনক ঘটনা আমরা এখন দেখছি। দ্বিতীয়ত, জরুরি অবস্থার দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরনটি প্রায় সব সংবাদপত্র অনুসরণ করত। প্রকাশিতব্য খবর বা প্রতিবেদনের যেসব অংশ শাসননীতি, ভালো হোক খারাপ অনেকখানি ছিল সংবিধানসম্মত। অধিকারের অতিরিক্ত প্রশাসনিক অপব্যবহারের এবং সেটা কোনো একটি বিশেষ 'আদর্শ'কে ব্যবহার করে ফায়দা তোলার চেষ্টা যেটা এখন করছে মোদী। উপনিবেশবাদবিরোধী ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতীয়দের যে অনুভূতি-তাকে শোষণ করে, তাকে ভাঙিয়ে এরা অন্য ধরনের বিজাতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যার মৌলিক চরিত্র একেবারেই দেশকে সংহত করে না বরং বিভাজিত করে। এই নতুন জাতীয়তাবাদ আর হিন্দুত্বকে সমার্থক বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টার ফলে জরুরি অবস্থার চেয়েও মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। ইন্দিরা জমানায় যারা তার সমালোচনা করতেন, তারা জনগণের কাছ থেকে এক ধরণের সামাজিক ও নৈতিক সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধি সেটা চান বা না চান।

কিন্তু এই মোদীমার্কা 'জাতীয়তাবাদী' দমন হাঁটে অন্যপথে। জনতার চোখে সমালোচকদের এরা সহজেই 'গণশত্রু' বলে দাগিয়ে দেয়। ফলে সমাজে তাদের অবস্থানকে হীন প্রতিপন্ন করে, তাদের মানবিক সম্মানকে পথে ধুলায় মিশিয়ে দেয়। এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসাধুতা, শত্রুপক্ষের চর অভিযোগ আরোপ করা হয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগিয়ে। আর পেছনে ট্রোল-আর্মি নামিয়ে দিয়ে। এদের মানবিক অস্তিত্বটাই গুঁড়িয়ে দিয়ে সামাজিক পরিসরের বাইরে ঝেটিয়ে বিদেয় করার চেষ্টা চলে অবিরত। এরকম ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।

তৃতীয়ত, জরুরি অবস্থার সময়ে প্রিন্ট মিডিয়াকে সেন্সরশিপের নিয়ন্ত্রণ মানতে বাধ্য করা হত। এর প্রতিবাদে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় ।সেন্সরের কাঁচিতে কাটা পড়ত, প্রকাশিত সংবাদপত্রে সেইসব অংশ ফাঁকা রেখেই প্রকাশিত হত যাতে পাঠক বুঝতে পারেন ফাঁকা জায়গায় যে খবর বা মতামত ছিল তা সরকারের সমালোচনামূলক ছিল বলেই তা সেন্সরের কাঁচির তলায় প্রাণ দিয়েছে। অর্থাৎ, সংবাদপত্রের সরকারের সমালোচনা করার সাহস তখন ছিল। পাঠকের কাছে এতে যেমন দৈনিকটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেত ও সরকারের বিরুদ্ধে লেখার সাহস প্রশংসিত হত, তেমনি গোটা সংবাদ জগতের টুটি চেপে ধরার কথা সরকারে ধারণায় ছিলনা অথবা গণতন্ত্রের এতটা কণ্ঠরুদ্ধ করতে প্রবল প্রতাপান্বিত ইন্দিরা গান্ধিও ভয় পেতেন। কিন্তু আজকের গণমাধ্যমগুলির গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তারা হিন্দুত্ব শিবিরের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তাদের কুকর্মের দোসর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যারা এখনও প্রতিবাদী অথবা ফেক নিউজ ফাঁস করে দিচ্ছে, আদ্যন্ত মিথ্যা অভিযোগে তাদের জেলে পাঠানো হচ্ছে (নিহত গৌরী লঙ্কেশ , সিদ্দিক কাপ্পান , প্রবীর পুরকায়স্থ এরকম আরও অনেকে)। এজেন্সীর হানায় তাদের হয়রানি করা হচ্ছে (দি ওয়্যার পত্রিকা)। একটা আলাদা, সংস্থাকে কিনে নেওয়া হয়েছে (এনডিটিভি)।

(ক্রমশ)

এক ড্রাইভার কী মওত
(রেল দুর্ঘটনার ময়নাতদন্ত)

বিবেক পানিগ্রাহি

১৬ই জুন, ২০২৪ সারা ভারত কেঁপে উঠল দুটি ট্রেনের সংঘর্ষের শব্দে। গতবছর করমন্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশ কাটার আগেই আরো একবার। উত্তরবঙ্গে রাঙাপানি স্টেশনের কাছে যাত্রীবোঝাই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনে এসে ধাক্কা মারলো মালবাহী ট্রেন। শেষের তিনটি বগি ক্ষতিগ্রস্ত , একুশ জন নিহত, বহু আহত। এক্সপ্রেস ট্রেনের গার্ড ও মালগাড়ির চালক দুজনেই দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

চালক অনিল কুমার সামনে ট্রেন দেখার পর শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন, জানতেন লোডেড গুডস ট্রেন এত কম ব্যবধানে দাঁড়াবে না। তবু একটু আস্তে হলেও ক্ষয়ক্ষতি যদি একটু কম হয়... আক্ষরিক অর্থেই এ ছিল তাঁর শেষ চেষ্টা। নিজের সিটেই আটকে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ।

রেলের পরিষেবার মান তলানিতে। তারই মধ্যে ঘন ঘন দুর্ঘটনার খবর, প্রানহানি। ক্ষোভে ফুঁসছে সারা দেশ। অতএব এবার আর নতুন ট্রেন উদ্বোধনের মুখশ্রী নয়, ব্যাটিং করতে পাঠানো হলো রেলবোর্ডের চেয়ারম্যানকে। কোনো প্রাথমিক রিপোর্ট, তদন্ত ছাড়াই, তিনি বেমালুম মৃত চালক অনিল কুমারের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দায় সারলেন। একবারও বলা হলনা, সেদিন সকাল থেকে দুটি স্টেশনের মাঝে নয়টি অটোমেটিক সিগন্যাল খারাপ ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটির কথা মেনে নিলে দায়টা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে রেলমন্ত্রীকেও নিতে হয়। অতএব সবটা হিউমান এরর বলে চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো।

তাহলে কী বলব চালকের কোনো দোষ ছিলনা? এক কথায় এর কোনো উত্তর হয়না। কারণ রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন বা সেফ ওয়ার্কিং রুলের নিশ্ছিদ্র বাঁধন এমনই যে, সিরিজ অফ মিসটেক অর্থাৎ অনেকে মিলে ভুল না করলে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

এক্ষেত্রে প্রথম ভুল হয়েছিল, রেল প্রশাসনের, মূলত অপারেটিং এবং সিগন্যাল ডিপার্টমেন্টের। উচিত ছিল এটাকে প্রলঙ ফেলিওর (prolong failure) ঘোষণা করে সেইমত লিখিত অনুমতিপত্র (written authority to proceed) দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কারণ পুরো সিগন্যালিং সিস্টেম ভোর পাঁচটা পঞ্চাশ থেকে বিকল। আর মালগাড়িটি অথরিটি পেয়ে স্টার্ট করেছে সকাল আটটা পঁয়ত্রিশে। এই prolong failure এর ক্ষেত্রে স্টেশনমাস্টার পরের স্টেশন মাস্টারের থেকে লাইন ক্লিয়ার নিয়ে চালককে T/D 912 ফর্মে অথরিটি দেবেন। তাতে মাঝের লাল অটোমেটিক সিগন্যালগুলোর নম্বর থাকবে, যাতে ট্রেনটি সেগুলো লাল অবস্থাতেই নরমাল স্পীডে পেরিয়ে যেতে পারে। তার বদলে স্টেশন মাস্টার দিয়েছেনঠ/ঙ ৯১২, যাতে কেবল ওই স্টেশনের শেষ সিগন্যাল লালে পার করা যেতে পারে, অথচ সেই ফর্মেই লিখে দিয়েছেন নয়টি সিগন্যালের নম্বর। এই অথরিটিটি ভুল শুধু নয়, বিভ্রান্তিকর। ফর্ম নম্বরে ঙ্গ আর ঙ তফাত মনে না থাকায় চালকও বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। এছাড়া লাইন ক্লিয়ার নিলে যে জ্জঙ্গ—দ্র দেওয়া হয়, সেটাও লেখা ছিলনা।লিখিত অথরিটির ভ্রান্তি ধরতে না পারাটাই চালক অনিল কুমারের ভুল বা অজ্ঞতা বলে ধরে নেওয়া যায়। মালগাড়ির গার্ড বা সহচালকেরও যদি এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকত, তাহলেও হয়ত দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তবে ওই ফর্মে সিগন্যাল নম্বরগুলির উল্লেখই কিন্তু মূল বিভ্রান্তির কারণ। যার জন্য ওই T/A 912'র ছবি মিডিয়ায় আসার পরই আমার কাছে দেশের বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার ও সেফটি অফিসারদের থেকে ফোন আসতে থাকে। সবাই বুঝতে চাইছে, এরকম জগাখিচুড়ি অথরিটির মানে কী।

এই যে আপনারা দেখছেন, স্টেশন মাস্টার হোক বা চালক অটোমেটিক ব্লক সিস্টেমের আইনকানুন নিয়ে তাঁদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, তার কারণ কী?

ঘটনাটি উত্তর পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনের। সেখানে মাত্র কয়েকমাস হলো অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম চালু হয়েছে। এই সিস্টেম এবং বিভিন্ন এবনরমাল পরিস্থিতিতে তার অথরিটিগুলো এতই জটিল যে প্রাথমিক ট্রেনিং, তিন

বছর পরপর রিফ্রেশার কোর্স ছাড়াও, চালকদের ছ'মাসে একদিন রীতিমত ক্লাসে বসিয়ে অটো কাউন্সেলিং করা হয়। অথচ এক্ষেত্রে স্পষ্ট অভিযোগ, কাটিহারের চালক বা স্টেশন মাস্টারদের অটোমেটিক সেকশন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। ঘটনাক্রম দেখলেও সেটা বোঝা যাচ্ছে। বহুদিন ধরেই সেফটি ক্যাটাগরিতে লোক কম। ফলে সময়সীমা কমাবার পরও প্রশাসন ঠিকমত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারেনি। শূন্যপদ পূরণ না হওয়ায় স্টেশন মাস্টার, চালকরা দিনের পর দিন ছুটি ছাড়া, সঠিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি ছ'মাসের অটোমেটিক সেকশন কাউন্সেলিং প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিনে ফুটপ্লেট ডিউটি যেতে যেতেই লোকো ইন্সপেক্টর কাউন্সেলিং করে দেন। চালকের রেকর্ডবুকে সেটা নথিবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ট্রেন চালাবার সময় চালকের সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকে স্পিড, কন্ট্রোল আর সিগন্যালের দিকে। ফলে এই নিয়মরক্ষার কাউন্সেলিং তার মগজে বসতে পায়না। T/A আর T/D গুলিয়ে ফেলতে সময় লাগেনা।

অর্থাৎ একের পর এক রেল দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংকোচনের নীতিও বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু রেল মন্ত্রক কোনোভাবেই দায় স্বীকার করবে না। তাই কয়েকটি ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার মিলে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে লিখতে বাধ্য হয়েছে দায় একমাত্র চালকের। একমাত্র লোকো ইন্সপেক্টর (চালকের সুপারভাইজার) অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে, যুক্তিসহ ডিসেন্ট নোট লিখেছেন, এ রিপোর্ট উনি মানছেন না।

এখনো আপাত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। আশা করা যাচ্ছে সেটায় প্রকৃত সত্য জানা যাবে। তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা অবশ্য বলা মুশকিল। কারণ করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় CR (ইন্টারলক মেশিনের ত্রুটিকে প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরলেও, সেটা কারা বসিয়েছে, কারা টেন্ডার পাশ করেছিল, মেইনটেনেন্সের দায়িত্বে কারা ছিল, সেসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রেল মন্ত্রক তিনজন কর্মচারীকে নাশকতামূলক কাজের দায়ে জেলে ভরেছে। সি বি আই তদন্তের নামে এত যাত্রীর মৃত্যুর সব দায় ঝেড়ে ফেলেছে।

এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। শূন্যপদ পূরণ হোক। সেফটি ক্যাটাগরির স্টাফেরা সঠিক প্রশিক্ষণ, সময়মতো ছুটি, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে ভারতীয় রেল এভাবেই ধীরে ধীরে জীবন-মৃত্যুর রোলার কোস্টারে পরিণত হবে।

রাহুল গান্ধীর কাছে অভিযোগ ঃ বিশ্রাম পান না লোকো পাইলটরা।

গত চার বছরে রেলওয়েতে একজনও লোকো পাইলট নিয়োগ করা হয়নি। বাড়ি থেকে বহু দূরে লোকো পাইলটদের ট্রেন নিয়ে যেতে হয়। তারপর কোনও বিশ্রাম ছাড়াই তাঁদের আবার ডিউটিতে যেতে হয়। তাঁরা বিশ্রামের কোনও সুযোগ পান না। এর ফলে চূড়ান্ত ক্লান্তিতে তাঁদের মনসংযোগ ব্যাহত হয়। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। একজন লোকো পাইলটের সপ্তাহে অন্তত ৪৬ ঘণ্টা বিশ্রাম প্রয়োজন। দুর্ঘটনা ঘটার পর গঠিত রেলের একাধিক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে শূন্য পদ পূরণের কথা। কিন্তু কিছুই হয়নি। গত ৫ জুলাই বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী লোকো পাইলটদের সঙ্গে কথা বলতে নয়াদিল্লি রেল স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁকে কাছে পেয়ে লোকো পাইলটরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ জানান।

লোকো পাইলটরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন রেলের বেসরকারিকরণ করতে চাইছে বলেই মোদী সরকার পরিকল্পিত ভাবে এই সব অবহেলা করে চলেছে।

রাহুল গান্ধী রেল কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তিনি অনেক আগে থেকেই এই সব সমস্যা নিয়ে বলে এসেছেন। তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে আবারও সরকারের কাছে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য দাবি জানাবেন।

নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ
মানবিকতার আলোকে হুমায়ুন কবীর

অরবিন্দ দাস

সাধারণ বাঙালি বা ভারতীয়দের কাছে হুমায়ুন কবীরের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে চিন্তক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছিলেন 'আমি মনে করি তাঁহার গভীর ভারতবোধই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি এক অখন্ড ভারতের কল্পনা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।'

এহেন প্রজ্ঞাবান বাঙালি সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? একমাত্র চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রচ্ছদের শীর্ষে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কবীরের জন্মশতবর্ষে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নিয়ে কোনো বই প্রকাশিত হয়নি।এটা বাঙালি সমাজে গ্লানির বিষয়।

হুমায়ূন কবীরের জন্ম ১৯০৬ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে এক অভিজাত শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে। মুঘল আমল থেকেই এই পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়। কবীরের প্রপিতামহ থেকে পিতা প্রত্যেকের আরবি-ফারসিতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। পিতা কবীরুদ্দিন আহমদ ও মাতা সাজেদা খাতুনের চতুর্থ সন্তান হলেন হুমায়ুন কবীর। পিতৃদত্ত নাম হুমায়ুন জহিরউদ্দিন একামিরে কবীর। পিতা ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং সরকার তাঁকে খান বাহাদুর আখ্যায় ভূষিত করে। পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে কবীরের পরিবারে প্রগতিশীল সংস্কৃতি মনন গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মননশীলতা, উদারতা, সাংস্কৃতিক মনস্কতা এই পরিবার থেকেই কবীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। হুমায়ুন ছিলেন ভারতআত্মার প্রকৃত সাধক।ইসলামিক সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। এছাড়া গবেষণা, রাজনীতি চর্চা, সাহিত্য, শিল্পভাবনা, বিজ্ঞান চেতনায় নিজেকে পূর্ণতর করেছিলেন। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও সারস্বত চর্চা থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। কারণ হুমায়ুনকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে রবীন্দ্রচর্চা আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিলেন তিনি, তার প্রমাণ পাই ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থেকে। পিতা কবীরুদ্দিন সরকারি উচ্চপদে থাকার ফলে চাকরীসূত্রে বিভিন্ন জেলায় বদলি হয়েছেন, সেই সুবাদে ঢাকা, কুমিল্লা, কৃষ্ণনগর, নওগাঁ প্রভৃতি শহরের হুমায়ুন কবীর পড়াশোনা করেছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নওগাঁ কে ডি (কালীধন দত্ত) স্কুল থেকে প্রথম স্থান লাভ করেন। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ছাত্র যিনি ইংরেজিতে লেটার পান। এরপর হুমায়ুন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন এবং ১৯২৪ সালে আই.এ. পরীক্ষায় লেটার নিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পরীক্ষায় প্রথম হন। বি এ পাশের পর সরকারি বৃত্তি পেয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। যদিও তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। এই কোর্সেও হুমায়ুন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং এক্সেটর কলেজ ফাউন্ডেশন প্রাইজ পান।

১৯৩২ সালে দেশে ফিরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের আহ্বানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে এক বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে দর্শন বিভাগে যোগ দেন। এখানে দর্শন ছাড়া তিনি নিয়মিত ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন। এই অধ্যাপনার সূত্রে ভারতের মহীশূর, আলীগড় ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

পরবর্তী জীবনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বদেশের আলিগড়, বিশ্বভারতী ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে হুমায়ুনের রাজনীতিতে আগ্রহ তৈরি হয়। ফজলুল হক সাহেবের প্রভাবে তিনি রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। কৃষক প্রজা পার্টির ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুমায়ুন কবীর। এই সময় মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কবীরের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগঠনের প্রায়ই বিরোধ ও সংঘর্ষ লেগে থাকত। ফলে তিনি বহুবার মুসলিম লীগের ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। দেশ স্বাধীন হল কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ধর্মীয় দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু হুমায়ুন কবীর পাকিস্তানে গেলেন না। প্রায় এক দশক সক্রিয় রাজনৈতিক জগৎ থেকে দূরে থেকে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম

শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালামের সচিব হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। এই সময় আজাদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'India Wins Freedom' লেখার কাজ শুরু করেন। আবুল কালাম আজাদ এই বই লেখার সময় উর্দুতে কাহিনী বলে যেতেন আর কবীর তার ইংরেজি অনুবাদ করতেন। আজাদ তারপর তা দেখতেন। শোনা যায় কোনও উর্দু শব্দের সঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ কি হবে তা তিনি জওহরলালের সঙ্গে আলোচনা করে লিখতেন। মৌলানা আজাদের মৃত্যুর প্রায় ১১ মাস পর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ বইটি প্রকাশ করে ওরিয়েন্ট লংম্যান। এই বই প্রকাশের পর ভারতীয় রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেকে অভিযোগ করেন হুমায়ুন কবীর সাহেবের কথা বিকৃত করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।এই কঠোর সমালোচনাকে প্রতিহত করতে নেহেরু কবীরের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

১৯৫৬ সালে কবীর রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৭ তে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পর (১৯৫৮) তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সময় পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে হুমায়ুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন লোকসভার নির্বাচিত সদস্য। ইন্দিরা গান্ধীর সময় তাঁকে মন্ত্রিত্বের পদ দিলে হুমায়ুন তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং কংগ্রেস ছেড়ে অজয় কুমার মুখার্জী ও সতীশ সামন্ত ' র সঙ্গে যোগ দিয়ে ' বাংলা কংগ্রেস ' দল প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকাকালীন পণ্ডিত নেহেরুর পরিকল্পনায় সাহিত্য একাডেমি, সংগীত-নাটক একাডেমি এবং ললিতকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন এই পরিকল্পনা রূপায়নে হুমায়ুনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।এছাড়া কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার ও পার্কস্ট্রিটে নতুন এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন নির্মাণে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল।

শিক্ষানুরাগী হিসেবে হুমায়ুন কবীরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৬০ সালে আমেরিকার চতুর্থ শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি হচ্ছেন প্রথম এশীয়, যিনি অক্সফোর্ডে, হার্বার্ট স্পেন্সার বক্তৃতাদ দেওয়ার সুযোগ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে এই বক্তৃতা দেন আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো মনীষীরা।

হুমায়ুন কবীর অসম্ভব উদার ও মুক্তমনের রাজনীতিবিদ ছিলেন। কোনো ইজমের ধাঁচে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। একথা প্রমাণ হয় যখন জানতে পারি কবীরের নির্বাচনী কেন্দ্রে তাঁর হয়ে প্রচারের জন্য উৎপল দত্ত ও শম্ভু মিত্র সহ বেশ কিছু বামপন্থী শিল্পী নাটক করেন।এছাড়া বামপন্থী সাংসদ হীরেন মুখার্জি ছিলেন কবীরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার। পরিতাপের বিষয় বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে এই উদারতা আমরা দেখি না।

সত্যি কথা বলতে কি হুমায়ুন কবীর শুধু বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান রাজনীতিবিদ ছিলেন তা নয়, তিনি উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এই হৃদয়বান মানুষটি সম্পর্কে অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছিলেন ত..রাজনৈতিক বক্তৃতায় কত কথা শুনি, কিন্তু হৃদয়ের কথা শুনি না। ইহার কারণ, আমরা আমাদের হৃদয় হারাইয়াছি। কবীরের একটি হৃদয় ছিল। সেই হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার প্রত্যেক রচনায়, সে কথা আমাদের আজ কে বুঝাইবে।দ

শুধু রাজনীতি নয় বিজ্ঞান সম্পর্কে হুমায়ুন কবীরের অনুসন্ধিৎসা ছিল। বিজ্ঞান সচেতন মানুষটির সঙ্গে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান ছিল। অধ্যাপক হাইজেনবার্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হুমায়ুন মনে করতেন প্রযুক্তি যেমন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্র যদি আনুষঙ্গিক পরিবেশ তৈরি করতে না পারে তবে দেশের বিজ্ঞানীরা বিদেশে পাড়ি দেবেন। বিজ্ঞান গবেষণা ও কর্মসূচি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে এই ধারণা যেমন জওহরলালের ছিল তেমনি কবীরেরও ছিল। মন্ত্রিসভায় তাই বিজ্ঞান গবেষণা ও সাংস্কৃতিদ নামে একটি মন্ত্রক খোলা হয়েছিল এবং তার দায়িত্বে ছিলেন কবীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স খোলার ব্যাপারে কবীরের অবদান ছিল।

দীর্ঘদিন রাজনীতিতে মগ্ন থেকেও প্রচুর পড়াশোনা –লেখালেখি করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম কোন অংশে কম ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য–সংস্কৃতি আখ্যানে হুমায়ুন কবীরের বিশেষ স্থান ছিল। ছাত্রবয়সেই লেখা শুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও অক্সফোর্ডে দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

হুমায়ুন কবীরের অক্ষয়কীর্তি মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গদ প্রকাশনা ও সম্পাদনা। এই পত্রিকা তিনি ১৯৩৯ সালে প্রকাশ করেন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ ঢাকা থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'ঊষালোক' হুমায়ুন কবীরের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করেন। তাঁদের তথ্য অনুযায়ী কবীরের প্রকাশিত সাতচল্লিশটি গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়।

হুমায়ূন কবীরের বিশেষ আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনের প্রতি। শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য নয়, কবীর কবিগুরুর পল্লিভাবনা, সমবায় রীতির পরিকল্পনাকে দেশ ও সমাজ গঠনের উপায় বলে মনে করতেন। আমরা সেই পথ অনুসরণ করতে পারিনি। মনস্তাপে কবীর লিখেছেন তদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের নকশা তৈরিতে ভারতীয় চিন্তাকে রূপদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ভারতবর্ষের বেশি লোক উপলব্ধি করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে হুমায়ুন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এতদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, দর্শন, শিক্ষাচিন্তাকে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার যথেষ্ট পরিকল্পনার অভাব ও অপূর্ণতা রয়েছে। এই অভাব পূরণ করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন হুমায়ুন কবীর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দুটি বইয়ের সংকলন ও সম্পাদনা করেন একটি Towards Universal Man(১৯৬১) আরেকটি ১০১Poems of Rabindranath Tagore(১৯৬৬) এবং এই দুটি বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন।

হুমায়ুন, বিশ্বকবির জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬১ সালে লন্ডনের স্কুল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিস, নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সের সহযোগিতায় তরবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ বক্তৃতাদর আয়োজন করেন।

হুমায়ুন কবীর , ১৩ এবং ১৫ জুন দুদিন যথাক্রমে 'Tagore as a humanist' ও 'Tagore and modern India' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। পরে ওই বছরই নভেম্বর মাসে 'Social and political India of Tagore' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যা সাহিত্য একাদেমির সেন্টিনারি ভল্যুমে প্রকাশিত হয়। এই সকল বক্তৃতা ও লেখার সারাংশ নিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লেখা সংযোজন করে 'Rabindranath Tagore' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইখানি জগৎবাসীকে ইংরেজি মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা, মানবিক বোধ, বিশ্ববোধকে পৌঁছে দেওয়ার সার্থক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রভাবনাকে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে প্রচার ও প্রসারের জন্য কবীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে রবীন্দ্রভবন নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। রবীন্দ্র–শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর এই উদ্যোগ ও পরিশ্রম বাঙালি সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি মুক্তমনা এই মানুষটি জন্মেছিলেন এক সমৃদ্ধ ইসলামিক সাংস্কৃতিক পরিবারে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মুসলমান ঐতিহ্যকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। ধর্মের উচ্চ আদর্শ থেকে সরে গিয়ে কখনো ধর্মাচরণ করেননি।

ধর্মনিরপেক্ষ হুমায়ুন বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন শান্তি দাসের সঙ্গে। শান্তি দেবী ছিলেন কটক রভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের ভাইজি। তাঁরা ছিলেন প্রগতিপন্থী ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তিনিও সারা জীবন রাজনীতি ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। হুমায়ুন ও শান্তি দেবীর পুত্র প্রবাহন কামাল কবীর একজন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক। থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কন্যা জয়তী ল্যয়লা কবীরও রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের ঘরণী ছিলেন। চিন্তাশীল বহুদর্শী কবীর ১৯৬৯ সালের ১৮ আগস্ট প্রয়াত হন এবং তাঁর মরদেহ জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবরস্থ করা হয়।

হুমায়ুন কবীরের জীবনচর্চা, চিন্তাশীলতা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদারতার পথ দেখাবে বলে মনে করি।।

সহায়ক রচনাপঞ্জি

১. চতুরঙ্গ, বর্ষ ৬৫, সংখ্যা ৩, বৈশাখ–আষাঢ় ১৪১৩।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হুমায়ুন কবীর , অনুবাদ–ভূমিকা–টিকা হায়াৎ মামুদ, একুশে পাবলিকেশনস্।

নদী তুমি কার

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ও রাহুল রায়

নদীমাতৃক ভারতবর্ষ সর্বত্রই সমানভাবে নদীসম্পদে সমৃদ্ধ নয়। নদীর জলপ্রবাহ তার জলধারণ ক্ষেত্রের আয়তন এবং প্রাকৃতিক উৎসস্থলের ধরনের উপর নির্ভরশীল। উত্তর ভারতের বরফ-গলা জলে পুষ্ট নদীগুলিতে সারা বছর কম-বেশি জল থাকে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি একান্তভাবে নির্ভরশীল বর্ষাকালের বৃষ্টির জল বা ভৌমজলের ওপর। আবার, ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মোহনা দিয়ে সামুদ্রিক জল জোয়ারে কিছু দূর অব্দি দেশের মধ্যে ঢোকে। কিন্তু এই জল নোনা বলে সরাসরি এর ব্যবহার নেই। কাজেই অফুরান প্রাকৃতিক সম্পদ সূর্যালোক ও বাতাসের মতো মানুষের রোজকার জীবনযাত্রার অপরিহার্য জল অফুরান যেমন নয়, তেমনই তার প্রাপ্তিও সর্বত্র এক নয়। অথচ প্রয়োজন একই রকম।

প্রাকৃতিক কারণেই স্থান ও কালের ভিত্তিতে জলসম্পদের বণ্টনে বৈষম্য রয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে। এই বৈষম্য নিয়েই নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, গঙ্গা, হোয়াংহো নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। এসব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে মূলনদী-উপনদী-শাখানদী সব মিলিয়ে তার স্বাস্থ্য, তার জলধারণ ও জল সরবরাহের ক্ষমতা। তাই নদী মানেই তার প্রবাহিত জলধারার খাতটি মাত্র নয়, কয়েক হাজার বছর ধরে এই জলপ্রবাহে জমির ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে যে উর্বর পলিস্তর জমেছে, সেখানে যে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি হয়েছে, মানব সভ্যতার যে বিবর্তন ঘটেছে -- সমস্ত কিছুই।

নদীকে জানা জরুরি

প্রধানত দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে নদীকে জানতে হয় ১. নদীর জলের উৎস কী এবং তার পরিমাণ কত এবং ২. নদী যে অঞ্চল থেকে জল সঞ্চয় করে, তার বিস্তৃতি। নদীর জল সঞ্চয় বা ধারণ অঞ্চলের চরিত্র নদী অববাহিকার আকার ও আয়তনের উপর নির্ভরশীল। একটি মূল নদী ও তার উপনদী-শাখানদী সব মিলে এক-একটি নদী ও তার প্রবাহপথ। এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তার অববাহিকা। বিভিন্ন নদীর অববাহিকা জলবিভাজিকা দিয়ে বিভক্ত। কোন নদী ব্যবহারের পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার সময় তাই নদীর সঙ্গে তার অববাহিকার সম্পর্কটিকে মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এইজন্যই নদী-ব্যবহার ও নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা নদী-অববাহিকা ধরেই করতে হয়।

মূলনদী-উপনদী-শাখানদীর দৈর্ঘ্য, প্রবাহিত অঞ্চলে ভূমির ঢাল ও জলপ্রবাহের মধ্যে সৃষ্ট ভারসাম্য গড়ে তোলে সমগ্র অববাহিকার বিশেষত্ব বা চরিত্র। অববাহিকার এই প্রাকৃতিক ভারসাম্যে ভূমি, নদী, তার দু'পাড়ের গাছপালা, নদীর বুকের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ সবাই গুরুত্বপূর্ণ। নদীকে জানতে হলে কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। পাহাড়ি অঞ্চলে গাছপালা কেটে সাফ করে মানুষ প্রকৃতিকে যে আঘাত করছে, নদী উপত্যকার নিচু অংশে তার পরিণাম ও ব্যাপকতা দেখা দিচ্ছে। নদীর প্লাবনভূমি বা সমভূমিতে ক্রমাগত মানুষ গড়ে তুলছে ঘনবসতি, রাস্তা ও রেলপথ। নদীশাসন-এর নামে তার স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে গড়ছে বড় বাঁধ। এতে নদীস্বাস্থ্য ক্রমশ বেহাল হয়ে নদীর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

নদীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও জল ব্যবহার

ভারতীয় উপমহাদেশে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র বাদে উত্তরাঞ্চলের বাকি সব নদীরই সৃষ্টি হিমালয় জলবিভাজিকার দক্ষিণে। হিমালয় পেরিয়ে উত্তর দিকে তিব্বত-এ (চিন-এ) সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটান এই পাঁচটি রাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত। এসব রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু-র মূলধারা এবং তাদের উপনদী-শাখানদী। ফলে এসব আন্তর্জাতিক নদীগুলির স্বাস্থ্য রক্ষা ও জল ব্যবহারের দায়দায়িত্ব সবকটি রাষ্ট্রের।

আবার গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র-এর আন্তর্জাতিক অববাহিকার বাইরে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সমস্ত নদীর অববাহিকার বিস্তার দেশের মধ্যেই। এই নদীগুলি নানান রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তাই এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও জল ব্যবহারের দায়দায়িত্ব কোন একটি রাজ্যের নয়। এখানে বলার, উভয় ক্ষেত্রেই সকলের জলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নদীর জল ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে।

নদী তুমি কার

নদী তুমি কার ?-, এ জিজ্ঞাসা কেবল সাম্প্রতিক কাল বা সাম্প্রতিক অতীতের নয়। ইতিহাস জানাচ্ছে, নদীর জলের দাবিদার কে বা কারা, এ নিয়ে সশস্ত্র বিবাদ দেখা গিয়েছিল ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন সুমেরিয়া দেশে উম্মা এবং লাগাশ এই দুটি শহরের জলবণ্টন এবং সেচ-সেবিত এলাকা নিয়ে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সশস্ত্র এই বিবাদটি চলেছিল প্রায় একশো বছর। উল্লেখ্য, পৃথিবীজুড়ে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৬৩৪টি জল নিয়ে বিবাদের ঘটনা ঘটেছে। আন্তর্জাতিক এই জলসম্পদ নিয়ে ৮০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩৬০০-এরও বেশি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

অতীতে ধারণা ছিল নদী যখন যে রাজ্য বা রাষ্ট্রের মধ্য

দিয়ে বয়ে যায়, নদীর ওপর তারই একচ্ছত্র অধিকার জন্মায়। বেশিরভাগ নদী-বিবাদের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে জলের চাহিদার কথা মাথায় না রেখে কেবল নদীর উচ্চগতিতে ও মধ্যগতিতে জলের যথেচ্ছ ব্যবহার বা অপব্যবহার। বর্তমানে এমন ধারণা থেকে মানুষ সরে এসেছে। নদীর মতো এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের নাব্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে নদীর জলের ব্যবহারের বিষয়টি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। যে সকল নদী একাধিক রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে প্রবাহিত, তাদের জল এবং নদীর জলের সাথে সংযুক্ত ভৌমজলের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত এক নির্দেশিকা গৃহীত হয় ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যাসোসিয়েশন-এর ৫২তম অধিবেশনে ফিনল্যান্ড এর হেলসিংকি শহরে ১৯৬৬ সালের অগাস্ট মাসে। এটি 'হেলসিংকি বিধি' নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ১৯৯৭ সালের 'কনভেনশন অন নন নেভিগেশনাল ইউসেজ অফ ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস' এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নিয়ম। একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে নদীর জলের ভাগাভাগির বিষয়ে এই নিয়মটি দুটি প্রধান নীতির ওপর জোর দেয়, (১) ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত ব্যবহার এবং (২) পড়শি রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না করার বাধ্যবাধকতা।

<u>নদীর জল ব্যবহার - এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ</u>

সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীর জল ব্যবহারের বিষয়টি সমস্ত রকম সংবাদমাধ্যমে আলোচনার শীর্ষে এসেছে। ভারতের নদীগুলির নাব্যতা ও তার জল ব্যবহারের প্রশ্নে দু'রকম সমস্যা দেখা যায়। প্রথমটি আন্তঃরাষ্ট্রীয়, দ্বিতীয়টি আন্তঃরাজ্য। সিন্ধু এবং গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বেলায় পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে খানিকটা সুরাহা হয়েছে। আর ঠিকঠাক বোঝাপড়ার অভাবে তিস্তা নদীর জল ব্যবহার প্রশ্নে সমস্যা যেন আর কাটতেই চায় না। আসলে সত্যটা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক সীমার দু'পাশে দু'টি ব্যারেজ নদীর সামগ্রিক সর্বনাশই ডেকে আনছে।

১৯৪৭ সালের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা কেবল মানুষকে ভাগ করেনি, প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রেও ভাঙন সূচিত করে। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের মধ্যে বয়ে যাওয়া নদীর জল বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি কী হবে, সে বিষয়টি প্রায় অনালোচিত থেকে যায়। ফলত সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তিস্তা নদীর জলবণ্টন নিয়ে এক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। তিস্তা নদীর মোট দৈর্ঘ্যের ২৯ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশে। তিস্তা-র আহরণ ক্ষেত্রের ১৬.৫ শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত। প্রসঙ্গত এখানে বলার, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফরাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর জলবণ্টন সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ফুরোচ্ছে আগামী ২০২৬ সালে। তার পরের বিষয়টি কিন্তু যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ, ফরাক্কা ব্যারেজে উপকারের থেকে অপকার বেশি হচ্ছে বলে ২০১৬ সালে বিহার রাজ্য থেকে দাবি করা হয়েছিল এই ব্যারেজ তুলে দেওয়ার জন্য।

ভারতের মতো বিশাল দেশে একাধিক রাজ্যের মধ্য দিয়ে অনেক নদী বইছে। স্বাভাবিক কারণেই নদীশাসন এবং নদীর জল ব্যবহারে কোন রাজ্যের দাবি এড়ানোর চেষ্টায় দু'টি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষের উদাহরণও ভারতে রয়েছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে কাবেরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে যে কলহ ও দাঙ্গা দেখা গেছে, তা উচ্চ বিচারালয় থেকে অসংখ্য কমিশন গঠন করে মেটানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণের রাজনীতি আজও কৃষ্ণা, কাবেরী-র জলবণ্টন সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনোই নদীগুলির স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক বা ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করা হল না, যার থেকে প্রয়োজনভিত্তিক সুচারু পরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

উত্তর ভারতে গঙ্গা-যমুনার জলবণ্টন নীতি প্রায় এক চিরকালীন সমস্যার মুখোমুখি। বহু পরিকল্পনা হয়েছে, কমিশন হয়েছে, কিন্তু আজও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ অব্যাহত। যমুনা-র জলবণ্টন নীতি নিয়ে দিল্লি ও হরিয়ানা-র মধ্যে আইনি লড়াই শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিচারালয়ে পৌঁছে যায়। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে হরিয়ানা সরকার বাধ্য হয় দিল্লি-কে জল সরবরাহ করতে। যমুনা নদীকে নির্মল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গঙ্গা-র দূষণমুক্তির পরিকল্পনা শতাব্দীর শেষ পর্বে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু যমুনা বা গঙ্গা-র জলকে নির্মল করার পরিকল্পনার চরম ব্যর্থতা আজ সর্বজনবিদিত। কোন রাজ্যের সামান্যতম উদ্যোগ নেই নদীর জলরাশি থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার, কিন্তু জলের ভাগাভাগিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে কেউ পিছপা নয়।

নর্মদা নদীর জলের ভাগাভাগি নিয়েও অনেক রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়েছে। পড়শি রাজ্যগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্মদা-র সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। নর্মদা-র জলের ভাগাভাগিতে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষের জমি জলের তলায় তলিয়ে গেছে।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ সতীশচন্দ্র মজুমদার 'রিভার্স অফ বেঙ্গল ডেল্টা' নামে যে বক্তৃতা করেন, তার এক অংশ এখানে অত্যন্ত

প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন- 'আলো ও হাওয়ার মতো যখন সব প্রাকৃতিক সম্পদ অসীম নয়, যেমন নদীর জল, কোন বিশেষ রাজ্য বা প্রদেশকে তার ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগে এই সম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া যায় না। এই সম্পদ ব্যবহারের সুবিধা সেই নদী-বিধৌত সব রাজ্যগুলির মধ্যে তাদের চাহিদা মতো ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে। নদী উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে সেচের জন্য অত্যধিক জল ব্যবহারে নিম্নাঞ্চলে জল সরবরাহ কমে যায়।'

আন্তঃরাজ্য নদী-বিবাদ এড়াতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বেশ কিছু নদীর সংযোগের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে রাজ্যগুলির মতামত না নিয়েই। এযাবৎ তিরিশটি নদী-সংযুক্তি প্রকল্প চিহ্নিত করা হলেও মাত্র একটি (মধ্যপ্রদেশ-এ কেন-বেতোয়া) সংযুক্তি-প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমালোচিত। কারণ এটি রূপায়িত হলে, প্রায় নয় হাজার হেক্টর জমি জলে ডুবে যাবে, যার মধ্যে 'পান্না বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র'-এর বাঘ ও শকুনের বাসভূমি রয়েছে। আন্তঃরাজ্য নদীর জলের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য শ্রীমজুমদার নদীর উপত্যকার রাজ্যগুলোকে নিয়ে নদী কমিশন গঠনের কথা বলেছিলেন এই বক্তৃতায়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পঁচাত্তর বছর পরেও তা আমরা করে উঠতে পেরেছি কিনা জানা নেই।

নদীস্বাস্থ্য ও মিঠাজলের চাহিদা

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় নদীতে বড় বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাধার বানিয়ে মানুষের রোজকার ব্যবহার্য জলের চাহিদা মেটাতে নদীতে জলপ্রবাহ বজায় রাখার যে একপেশে চিন্তাভাবনা আমরা করেছিলাম, তাতে নদীস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র। উন্নয়ন ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ সমস্যার বিষয়টি খেয়াল রেখে মানুষ ও নদীর মধ্যে এক সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার কার্যকারিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। আজও যে এমন চিন্তাভাবনা থেকে আমরা সরে আসতে পেরেছি, তা-ও নয়। স্বাধীনতার পর দেশের সর্বত্র জনসংখ্যা বেড়েছে। শিল্প-কৃষির বিস্তার ঘটেছে। ফলত পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মিঠাজলের চাহিদা। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মেই জলের বণ্টন সর্বত্র সমান নয়। এটি জানা সত্ত্বেও আগুপিছু মাথায় না রেখে সীমিত এই প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করেই চলেছি।

স্বাধীন ভারতে প্রায় কোনরকম পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন নদীর উপর বড় বাঁধ দিয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নদীশাসন করতে চেয়েছে, আর নদী তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে বারবার মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদীগুলির দূষণ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু সেই সমীক্ষায় নদীর সামগ্রিক গতিময় স্বাস্থ্য বা তার জীববৈচিত্র্যের কী অবস্থা, তার বিশ্লেষণ অধরা থেকে গেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিবেদন থেকে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত নদী মারাত্মক ভাবে দূষণে ভারাক্রান্ত এবং নদীগুলির নাব্যতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের নদীগুলিকে দূষণমুক্ত করার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তার পরিণতিও অত্যন্ত করুণ। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির তৎকালীন অবস্থা সংক্রান্ত একটি সমীক্ষার আয়োজন করেছিল। কিন্তু তার পর থেকে অনেকটা সময় কেটে গেলেও নতুন কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে শোনা যায় না। অদ্ভুত এক রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার জন্য ভারতবর্ষের নদী-সম্পদের যথাযথ তথ্যভিত্তিক মানচিত্র আজও তৈরি হয়নি। স্বাধীন ভারতের অন্যতম দায়বদ্ধতা হওয়া উচিত ছিল নদীগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা, কারণ নদীস্বাস্থ্য-র ওপরেই ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা নির্ভরশীল। কৃষিনির্ভর ভারতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি নদীর জল। অথচ নদী এবং বিস্তৃত জলাভূমি রাষ্ট্রীয় ভাবনায় আজও ব্রাত্য থেকে গেছে।

কথা শেষের কথা

নদী তুমি কার অর্থাৎ নদীর জলের দাবিদার কে বা কারা, এই প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে ভারতের বিশিষ্ট সেচ-বিশেষজ্ঞ কে এল রাও-এর এক উক্তির কথা বলতেই হয়। রাও বলেছিলেন যে, নদীর জলে দাবিদার যে মানুষ একাই নয়, তা সে প্রায় ভুলেই গেছে। এই জলের দাবিদার মাছ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। এরাই আদি দাবিদার। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ এসে তার নিজের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্যরা সয়েছে অপূরণীয় ক্ষতি। তাই কোন নদী-অববাহিকার পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নদীর চরিত্র ও তার বাস্তুতান্ত্রিক সমীক্ষা ছাড়া কখনোই হতে পারে না।

একুশ শতককে 'পরিবেশ শতক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ সমস্যার অন্যতম আলোচ্য হল মিঠাজলের চাহিদা পূরণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বে দু'শো কোটি মানুষ জলের অভাবে মৃত্যুর অপেক্ষায়। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় নদীগুলির নাভিঃশ্বাস উঠেছে। পৃথিবীতে যে দশটি নদী আগামী দিনে অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি, তাদের মধ্যে দু'টি নদী ভারতবর্ষের -- গঙ্গা এবং সিন্ধু। কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রক-এর তথ্য জানাচ্ছে, ২০২১ সালে ভারতে মাথাপিছু জলের জোগান ছিল ১৪৮৬ বর্গমিটার। ২০৩১ সালে এটি মাথাপিছু কমে দাঁড়াবে ১৩৬৭ বর্গমিটার। উল্লেখ্য, মাথাপিছু

জলের জোগান ১৭০০ বর্গমিটারের কম হলে তা জলসংকট হিসেবে ধরা হয়। সম্প্রতি 'মুডিজ রেটিংস' প্রতিবেদনে আভাস দেওয়া হয়েছে যে, ভারতের অর্থনীতি এই ২০২৪ সালে অন্যান্য জি-২০ দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ৬.৫ শতাংশ হারে বাড়বে। ২০২২ সালে যেখানে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ শহরে বাস করত, আগামী দিনে আরও মানুষ শহরমুখো হবে। আর এসবের নিট ফল হল জলের চাহিদা বৃদ্ধি। আমাদের ভুলে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না যে, এরই মধ্যে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, এমনকি মুম্বাই-তেও ভয়ানক জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা জল নিয়ে তীব্র লড়াই দেখবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন।

ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা বহুদিন আগেই দেশের নদীস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সুচিন্তিত বিজ্ঞানধর্মী নদী পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। কে এল রাও-ও নদীর উন্নয়নের জন্য নদী-অববাহিকা ভিত্তিক কমিশন গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। তিনি চেতাবনি দিয়েছিলেন- 'ডু নট ডিস্টার্ব দ্য বেসিন।' কিন্তু আমরা এসব কথায় কান দিইনি। ক্রমাগত নদীর স্বাস্থ্যহানি করেছি। ভুলেই গিয়েছি রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী , 'প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা।'

অগ্নিপথ যোজনা কি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে আত্মঘাতী ?

শুভাশিস মজুমদার

অগ্নিপথ যোজনা কি দেশে দুই ধরনের সেনা তৈরি করছে ? এক যাঁদের পেনশন আছে এবং শহীদের সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে এবং দুই, যাঁদের পেনশন নেই বা শহীদের সম্মান পাওয়ার অধিকার নেই। মাত্র ছয় মাসের ট্রেনিং দিয়েই দেশের সীমানায় অগ্নিবীরদের নিযুক্ত করা হচ্ছে। যা বাস্তব সম্মত নয় । প্রশ্ন আরো আছে। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে, অগ্নিবীরদের কি সরকারের পক্ষ থেকে পরিবারের ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা আছে, নাকি শুধুই বীমার অধীনে সুরক্ষার ব্যবস্থা ?

মাত্র চার বছর চাকরি করার পর বেকার হয়ে যাওয়া অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ কি হবে ? সরকার কি খরচ বাঁচাতে গিয়ে দেশের সুরক্ষার সঙ্গে সমঝোতা করছে ? এটি কি একটি আত্মঘাতী যোজনা ? প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারেরা যাঁরা একসময় অগ্নিপথের সমর্থনে ছিলেন, এখন তাঁরা কেনই বা এর সমালোচনা করছেন ? তাহলে কি মোদী সরকারের আরো একটি তথাকথিত মাস্টার্স স্ট্রোক ব্যর্থ হতে চলেছে ?

অগ্নিবীরদের ভবিষ্যত নিয়ে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে এইসব প্রশ্নই উঠে এসেছে। সারাদেশ জুড়ে তোলপাড় চলছে।

১৮ জানুয়ারি, ২০২৪, জম্মু-কাশ্মীরের এলওসি তে অগ্নিবীর অজয় কুমার ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মারা যান। সম্প্রতি সংসদে রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন যে এই ঘটনার পরে ছয় মাস কেটে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অজয় কুমার এর পরিবারকে কোনো সাম্মানিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। প্রত্যুত্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সংসদে বলেন যে রাহুল গান্ধি বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ করছেন। যদি কোনও অগ্নিবীর দেশের জন্য জীবন দেন তাহলে তাঁর পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকার সহায়তা মূল্য প্রদান করা হয়।

এর পরেই রাহুল গান্ধি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আনেন যেখানে শহীদ অজয় কুমারের পিতা চরঞ্জিত সিং বলছেন, তাঁর পরিবার ইন্সুরেন্সের টাকা এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ধনরাশি পেয়েছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন টাকাই (তখন পর্যন্ত) পাননি। তাই এক কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেওয়ার যে বক্তব্য রাজনাথ সিং সংসদে রেখেছেন তা সঠিক নয়।

অগ্নিবীর নিয়ে দেশজুড়ে, বিশেষত বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানায় ক্ষোভ দানা বাঁধছে। শুধু অর্থের ব্যাপারই নয়, এ যেন ভারতীয় সেনার উপর এক 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' ! এতে ভারতীয় সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে বলে অনেকেই সমালোচনা করছেন।

রিটায়ার্ড আর্মি চিফ জেনারেল এম এম নারাবনে তাঁর অটোবায়োগ্রাফিতে (যা শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন অনিশ্চিত) লিখেছেন, সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পরে, ২০২০ - র প্রথম দিকে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে 'ট্যুর অফ ডিউটি' প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প সময়ের জন্য কেবলমাত্র স্থল সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণ। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই সরকার আরো ব্যাপকতার সাথে এক

প্রকল্প নিয়ে আসে যা একই সঙ্গে স্থল সেনাবাহিনী, নৌ সেনাবাহিনী ও বায়ু সেনাবাহিনীতেও লাগু করা হয়। স্থল সেনাবাহিনী এতে আশ্চর্যই হয়েছিল। কিন্তু নৌ সেনাবাহিনী ও বায়ু সেনাবাহিনীর কাছে এটা ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত!

দেশের প্রতিরক্ষায় পি বি ও আর (পার্সোনেল বিলো অফিসার র‍্যাঙ্ক) - সেপয়, নায়েক, ল্যান্স নায়েক, সুবেদার এবং সুবেদার মেজর নিয়ে তৈরি যা কিনা পদাতিক বাহিনীর মেরুদন্ড হিসেবে ধরা হয়। বৃহত্তম সংখ্যায় এঁরাই নিযুক্ত হয়ে থাকেন। অগ্নিপথ প্রকল্প এই ব্যবস্থাকেই আমূল বদলে ফেলেছে। পি বি ও আর নিযুক্ত হওয়ার পরে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তাঁদের ১৭ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে কর্তব্য পালন করতে হয়। অবসরের পরেও প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে তাঁদের পুণরায় নিয়োগ করা হতে পারে। মাসিক বেতন, পরিবারের সদস্যদের হেলথ ইন্সুরেন্স, রিটায়ারমেন্টের পরে আজীবন পেনশন এবং ক্যান্টিন এর সুবিধা - এঁরা পেয়ে থাকেন। কর্তব্য পালনের সময় দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এঁদের কারো মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর পরিবার মাসিক পেনশন, এককালীন আর্থিক সহায়তা মূল্য, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং (ডিফেন্স) ক্যান্টিনের সমস্ত সুবিধা পেয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে সম্মানজনক ব্যবস্থা।মৃত জওয়ান পান শহীদের সম্মান।

অগ্নিপথ যোজনার ফলে সেনাবাহিনীতে পূর্ণ মেয়াদের জন্য যে স্বাভাবিক হারে সেনা নিয়োগ করা হতো, তা যথেষ্ট হ্রাস পাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এবং তাহলে দেশের সুরক্ষার সঙ্গে সমঝোতা করা হবে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার তা অস্বীকার করছে।

সরকারের তরফে আর্থিক দায়ভার কমানোর উদ্দেশ্যেই অগ্নিপথ যোজনার সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিরক্ষা বাজেটের ৫৫ শতাংশ খরচ হয় মাসিক বেতন এবং পেনশন দিতে। ২০১৩-২০১৪ সালে এই বাজেটের ১৮ শতাংশ পেনশন দিতে খরচ হতো, যা ২০২৩-২০২৪ এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ শতাংশ। এর ফলে সমরাস্ত্র আধুনিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। চীন সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণে বাজেটের ৪০ শতাংশ খরচ করে, সেখানে ভারত খরচ করে মাত্র ২৫ শতাংশ।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর পি বি ও আর-দের গড় বয়স, যা ৩২ বছর। অন্য দেশের তুলনায় যা অনেকটাই বেশি। অন্যান্য দেশে এই গড় বয়স ২৫ বছর।

সুতরাং, সমস্যা অবশ্যই আছে। কিন্তু তার সমাধানও উপযুক্ত এবং বিস্তারিত শলা পরামর্শ করে সুবিবেচনার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা উচিত। এক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে করা নোট- বন্দির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে হঠাৎ নোট বন্দি চালু করে কালো টাকা উদ্ধার হয়নি তা আজ পরিষ্কার। ছোট ও মাঝারি শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে।এই ঘটনারই একপ্রকার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অগ্নিপথ যোজনা, শুধু ক্ষেত্রটা আলাদা। এই যোজনা অনুযায়ী মাত্র চার বছরের জন্য অগ্নিবীরদের নিয়োগ করা হবে। চার বছর বাদে ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীর কর্মচ্যুত হবেন, আর কেবল ২৫ শতাংশই আরো ১৫ বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে কাজ করতে পারবেন। অগ্নিবীরদের বেতন মাসে ৪০ হাজার টাকা, আর অবসরের সময় ১১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা হাতে দেওয়া হবে, যাকে সেবানিধি বলা হচ্ছে। এই ধন রাশির পঞ্চাশ শতাংশ আসলে অগ্নিবীদের বেতনের টাকা থেকেই জমা হবে এবং বাকি পঞ্চাশ শতাংশ সরকার দেবে। এই সময়, একটি বিশেষ স্কিলের শংসাপত্র পাওয়া যাবে, যা পরবর্তীকালে ব্যাংক লোন পেতে, অথবা রাজ্য সরকারের পুলিশ অথবা সেন্ট্রাল আর্ম ফোর্সে নিয়োগে সহায়তা করতে পারে বলে জানানো হচ্ছে।

অগ্নিপথ যোজনা ঘোষণা হওয়ার পরেই বিহার, উত্তর প্রদেশ, ।রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে এর বিরোধ শুরু হয়। অনেক তরুণ, যারা সেনা বাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নেয়, হতাশ হয়ে তারা সেই প্রস্তুতি বন্ধ করে দেয়।

অগ্নিপথ যোজনার সবথেকে সমালোচিত দিকটি হচ্ছে অবসরের পরে অগ্নিবীরদের পেনশন না দেওয়ার ব্যবস্থা। পুলওয়ামার শহীদদের নামে ভোট চাইলেও, অগ্নিবীরদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা না রেখে অর্থ বাঁচানোর কৌশল মোদী নিয়েছেন। এটাই মোদীর তথাকথিত মাস্টারস্ট্রোক। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিবীররা গ্রাচুইটি, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স, লিভ এনক্যাশমেন্ট, আর্মি ক্যান্টিন এবং পরিবারের হেলথ ইন্সুরেন্স প্রভৃতি সুবিধা থেকেও বঞ্চিত।

১ জুলাই, রাহুল গান্ধি সংসদে শহীদ অগ্নিবীর অজয় সিং এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে তাঁর পরিবার এখনও আর্মি অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সহায়তা রাশি পায়নি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তৎক্ষণাৎ জানান যে রাহুল গান্ধি সংসদ কে ভুল তথ্য দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক নিহত অগ্নিবীর কে ১ কোটি টাকার সহায়তা রাশি দেওয়া হয়। ৪ তারিখ শহীদ অজয় সিং এর পিতা জানান, রাহুল গান্ধি সঠিক বলেছেন। অগ্নিবীর অজয় সিং এর মৃত্যুর ৬ মাস পরেও এখনো কেন্দ্রের তরফ থেকে কোন সহায়তা রাশি তার পরিবার পায়নি। আর্মি ইন্স্যুরেন্স এর ৪৮ লক্ষ টাকা এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের ৫০ লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্স (সব মিলিয়ে ৯৮ লক্ষ টাকা) তাঁর পরিবার পেয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অন্য কোন সহায়তা রাশি তখনও তাঁরা পাননি। উল্লেখ্য, বীমা এবং সরকারের সহায়তা রাশি এক নয়। এর সঙ্গে শহীদ অগ্নিবীরের সম্মানের প্রশ্নও জড়িত। এই সহায়তা রাশির মূল্য প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা যা তখনো পর্যন্ত পরিবারের হাতে পৌঁছয়নি, যদিও ছয় মাস ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। এই বিতর্কের মধ্যে, আর্মির তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের পরে সত্বর ওই সহায়তা রাশি প্রদান করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে আশ্চর্যজনকভাবে, ৫ জুলাই, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবরে দেখা যাচ্ছে যে খানা মিউনিসিপালের সিনিয়র সুপারেনটেনডেন্ট অফ পুলিশ আমনীত কোন্ডাল জানিয়েছেন যে আর্মি তরফ থেকে তাঁর কাছে পুলিশ ভেরিফিকেশনের কোন অনুরোধই আসেনি। লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার সাক্সি সাওনেই জানিয়েছেন যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে এর কোন কাগজপত্র পড়ে (পেন্ডিং) নেই, আর অগ্নিবীর অজয় সিং এর ব্যাটেল ক্যাজুয়ালটি সার্টিফিকেট তাঁদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। যদিও তাঁদের তরফ থেকে ১১ই মার্চ এই সার্টিফিকেট চেয়ে পাঠিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে রাহুল গান্ধি সঠিক বলেছিলেন। অজয় সিং এর মৃত্যুর ৬ মাস পরেও তাঁর পরিবার সরকারের দেওয়া সহায়তা রাশি পাননি। এখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর জবাব দেওয়া উচিত যে তিনি যে সহায়তা রাশি প্রদানের কথা বলেছিলেন তা কি বীমার টাকা, নাকি এক্সগ্রেসিয়া। অগ্নিবীর শহীদ হওয়ার ছয় মাস পরেও এই সহায়তা রাশি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা কেন ?

সব থেকে বড় সমস্যা এই অগ্নিবীরদের অবসরের পরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সরকার বলছে, অবসরের পরে এঁদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগের কোটা দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানেই এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য এই ধরনের কোটা আছে। সাধারণত ৩৮ বছর বয়সে অবসরের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স অথবা সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ - এ চাকরির জন্য ১০ থেকে ২০ শতাংশ এক্স সার্ভিসম্যান রিজার্ভেশন কোটা আছে। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৭ টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে মাত্র ৩৪ টিতে গ্রুপ সি তে ১.২৯ শতাংশ এবং গ্রুপ ডি তে ২.৬৬ শতাংশ কর্মী ওই কোটায় নিযুক্ত। অর্থাৎ কোটা থাকলেও চাকরির সুযোগ কম। দীর্ঘ ১৭ বছর চাকরি করার পরেও যখন এক্স সার্ভিসম্যানরা এই সুযোগ পান না তখন মাত্র চার বছর চাকরি করার পরে অগ্নিবীররা যে এই সুযোগ পাবেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য। ২০২০, ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল বিপিন রাওয়াত পার্লামেন্টারি কমিটি অফ ডিফেন্স এর সামনে নিজে এই কথা বলেছিলেন যে ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকার পরে একজন এক সার্ভিসম্যানের চাকরি খোঁজার যে মরিয়া চেষ্টা করতে হয়, সেটা খুবই অসম্মানজনক। বোঝাই যাচ্ছে অগ্নিবীরদের পক্ষেও ওই একই কাজ অসম্মানজনক হবে। এই সমস্ত কিছুর কারণেই বিশেষত উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অগ্নিপথ যোজনার বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। এই সমস্ত জায়গায় গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল বেশ খারাপ হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের রিটায়ার্ড অফিসারেরা অগ্নিপথ যোজনার সমালোচনা করছেন। অগ্নিবীরদের এই স্বল্প সময়ের ট্রেনিং কখনোই সুদক্ষ করতে পারে না। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল অমৃত পাল সিং (রিটায়ার্ড) এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, যাঁরা সেনায় নিয়মিত কাজ করার সুযোগ পাবেন, এই পরিমিত ট্রেনিং তাঁদের জন্য অসাম্য তৈরি করবে। সেনার কাছেও এটা একটা বোঝা স্বরূপ। নেভি এবং এয়ার ফোর্স এর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো গভীর। এখানকার সমরাস্ত্র আরো জটিল এবং উন্নত। প্রাক্তন নৌ সেনাপ্রধান, জেনারেল অরুণ প্রকাশ বলেছেন, এক্ষেত্রে

ন্যূনতম পাঁচ ছয় বছরের ট্রেনিং দরকার।

চাকরির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে জেনারেল নারাবনের প্রস্তাব ছিল এই নিয়োগ থেকে ৭৫ শতাংশ কে পূর্ণ মেয়াদের চাকরি দেওয়া হোক এবং ২৫ শতাংশকে বরখাস্ত করা হোক। কিন্তু সরকার করেছে ঠিক এর উল্টো। ফলস্বরূপ, অগ্নিবীরদের নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতার জায়গায় এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব অনুসন্ধানেই দেখা যাচ্ছে যে অগ্নিবীরদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ এবং সহযোগিতামূলক আচরণ কম, তার জায়গায় দখল নিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অবিশ্বাস। সেনাবাহিনীতে এই আচরণ একেবারেই কাম্য নয়। প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিনোদ ভাটিয়া টুইট করে একে 'ডেথনেল' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যে এত বড় যোজনা চালু করার আগে কোন পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা। তিনি আরো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে অবসর পাওয়ার পরে হতাশ হয়ে এই সমস্ত অগ্নিবীরদের একাংশ নানারকম অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারেন। অনেকের আশঙ্কা, এমনকি এঁরা বিদেশের কোন প্রাইভেট আর্মিতেও যোগ দিতে পারেন। এর কোনটাই কাম্য নয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি বলেছেন যে অগ্নিবীর প্রকল্প চালু করার আগে অনেক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। প্রশ্ন থাকছে,তাহলে কেন জেনারেল এমএম নারাবনে বলেছেন, এই প্রকল্প বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এসেছে। কেনইবা একের পর এক প্রাক্তন সেনা অফিসারেরা এর সমালোচনা করছেন? ? যাঁদের মধ্যে জেনারেল জি ডি বকশির মত ব্যক্তিও আছেন যিনি একসময় মোদী সরকারের কট্টর সমর্থক ছিলেন। সম্প্রতি শহীদ ক্যাপ্টেন অংশুমান সিংয়ের মা মনজু সিং প্রধানমন্ত্রী কে অগ্নিবীর যোজনা তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজনাথ সিং কি বলতে পারেন কার কার সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল ? দেশবাসীর তা জানার অধিকার আছে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা, বিশ্লেষণ না করে ভুল জি এস টি চালু করারএবং নোট বন্দির খেসারত দেশবাসী দিয়ে চলেছে। নতুন কৃষি আইনের ক্ষেত্রেও এই পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল। আন্দোলনের ফলে প্রায় সাতশোর বেশি কৃষকের মৃত্যু হয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, অর্থ বাঁচাতে যখন দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গে সমঝোতা করা হচ্ছে, তখন নতুন পার্লামেন্ট হাউস বানানোর কি প্রয়োজন ছিল !

রাজনাথ সিং আরো বলেছেন যে বিদেশে এই ধরনের যোজনা অনেক দেশে চালু আছে। বিশেষত তিনি আমেরিকার কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য আমেরিকাতে এই ধরনের ট্যুর অফ ডিউটি তে যদি কোন নাগরিক স্বল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত হন তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনরাশি দেওয়া হয়। তিনি যদি সমর্থ হন এবং এই সেবার মেয়াদ বাড়াতে চান সে ক্ষেত্রেও সরকার তাঁকে সহায়তা করে থাকে। কর্তব্য পালনে মৃত্যু হলে সরকারের তরফ থেকে তাঁর পরিবারকে ততটাই সহায়তা প্রদান করা হয় যতটা একজন রেগুলার আর্মির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আমাদের দেশের অগ্নিবীর প্রকল্পের সঙ্গে তাই তার কোন তুলনা হয় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে অনতিবিলম্বে এই প্রকল্পের কিছু পরিমার্জন করা উচিত। অন্তত ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরদের চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে স্বাভাবিক সেনাদের মত করা হোক। বাকিদের চার বছরের জায়গায় অন্তত সাত বছরের সেবার মেয়াদ করা হোক। তাতে অর্থের খরচ বেশি কমানো না গেলেও পরিস্থিতির অবনতি কমবে। আর শুধুমাত্র অর্থ বাঁচাতে দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গে সমঝোতা করা কখনোই উচিত নয়। নীতি এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা বাজেটের তিনগুণ চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা বাজেটও বাড়াতেই হবে। চমক দিয়ে তাৎক্ষণিক কৃতিত্ব নেওয়ার প্রবণতাকে বন্ধ রেখে সরকারের (পড়ুন মোদীর) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে।